www.BANGLAKITAB.com

আর্‌রেযা বিদ্‌দুনিয়া

[দুনিয়ার প্রতি সন্তোষ]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُوْنَ ۙ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

সূচনা

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের এক বিশেষ দোষের নিন্দাবাদ করিতেছেন। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উক্ত বিনিন্দিত সম্প্রদায়ভুক্ত একজন লোকও নাই। কিন্তু তাহাতে আমার এই বক্তব্যকে সম্পর্কহীন এবং অনাবশ্যক মনে করা উচিত হইবে না; বরং ইহাতে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, মূল সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত মানুষই এক! কাজেই যে ব্যক্তি নিন্দনীয় হয়, মূল সত্তার কারণে হয় না; বরং কোন বিশেষ দোষের কারণে মানুষ নিন্দনীয় হইয়া থাকে। উক্ত নিন্দনীয় দোষ যাহার মধ্যে থাকিবে সে ব্যক্তিই নিন্দিত হইবে। যাহার মধ্যে উক্ত দোষ থাকিবে না সে নিন্দিত হইবে না। কোরআন শরীফ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, যাহার নিন্দা করা হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিন্দনীয় দোষগুলিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাদের বিশেষ বিশেষ গুণই হইল সন্তুষ্টির মূল। যেহেতু তাহাদের মধ্যে এইসব গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই আমি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি।

সুতরাং বুঝা গেল যে, প্রশংসা বা নিন্দা প্রভৃতি প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় গুণাবলীর কারণেই হইয়া থাকে। যাহার মধ্যে যেরূপ গুণ থাকিবে সে তদ্রূপ ফলই প্রাপ্ত হইবে। উপরোক্ত বর্ণনায় আর একটি প্রশ্নেরও উত্তর হইয়া গিয়াছে। কেহ মনে করিতে পারেন, যে সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে, তাহাদের একজন লোকও যখন এই মজলিসে নাই, তবে এই

www.BANGLAKITAB.com

আয়াতগুলি এই মজলিসের জন্য কেন অবলম্বন করা হইল? অনুবাদ হইতে বুঝিতে পারিবেন, কোন্ সম্প্রদায়ের নিন্দা করা হইয়াছে, কিন্তু আমি পূর্বাহ্নে বলিয়া দিতেছি যে, সে নিন্দিত সম্প্রদায় কাফের। এই কারণেই প্রশ্ন উঠে যে, কাফেরদের সম্বন্ধীয় আয়াত এখানে কেন পাঠ করা হইল? এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়াই কোন কোন লোক' কোন নিন্দা বা আযাবের আয়াত কাফেরদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে জানিয়া নিশ্চিন্তই হইয়া বসে। মনে করিতে থাকে, বাঁচা গেল, লক্ষ্যস্থল আমরা নহি। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখার বিষয়, যে আয়াত কাফেরদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে তাহা শুনিয়া মুসলমানদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হওয়ার পরিবর্তে উহাকে ভীষণ চাবুক মনে করা উচিত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়! মুসলমানগণ ইহা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন যে, ইহা তো কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

প্রশংসনীয় গুণ সন্তুষ্টির মূল ঃ বন্ধুগণ! ইহা সত্য যে, এই আয়াতে কাফেরদেরই নিন্দাবাদ রহিয়াছে এবং কোরআনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাফেরদেরই নিন্দা করা হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের নিন্দা কোরআনে খুবই কম। কিন্তু চিন্তার বিষয়, কাফেরদের নিন্দাবাদের কথা আমাদিগকে কেন শুনান হইতেছে? ইহার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত নিন্দনীয় দোষসমূহ মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া গেলে অত্যধিক বিস্ময়ের বিষয় হইবে। এই জাতীয় দোষ কাফেরদের মধ্যেই হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, কাহারও মূল সত্তার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার শত্রুতাও নাই, অনুরাগও নাই; বরং মানুষের প্রশংসনীয় গুণাবলী তাঁহার সন্তোষের ভিত্তি এবং নিন্দনীয় দোষাবলী তাঁহার অসন্তোষ ও নিন্দাবাদের ভিত্তি। অতএব, যদি উক্ত নিন্দনীয় দোষসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত এবং দাবীদার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে ইহাতে অধিক লজ্জিত হওয়া উচিত এবং অনুমান করিয়া দেখা উচিত, যে দোষের কারণে কাফেরদের তিরস্কার ও নিন্দা করা হইয়াছে, ঠিক সেই দোষই যদি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে খুব ভালরূপে উহাদের সংশোধন করা আবশ্যক।

মনে করুন, এক বিদ্রোহী প্রজাকে বাদশাহ খুবই তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, তুই বিদ্রোহ করিয়াছিস, তুই এটা করিয়াছিস, ওটা করিয়াছিস ইত্যাদি। এই তিরস্কার ও ডাঁট-দাপট শ্রবণ করিয়া অন্যান্য অপরাধীদেরও ভীত হওয়া উচিত, নির্ভীক থাকা উচিত নহে। তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, বিদ্রোহী লোকটি যেসমস্ত ধারার অপরাধে অপরাধী, উহার সবগুলি কিংবা আংশিক অনুরূপ দোষ আমার মধ্যে আছে কিনা? অথবা মনে করুন, কোন এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক জনসাধারণের উপর যুলুম করে, প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করে, কিংবা ডাকাতি করে; কিন্তু বিদ্রোহী নহে। অবশ্য ফৌজদারী দণ্ডবিধির অনেক ধারাই তাহার উপর প্রযোজ্য। ঘটনাক্রমে তাহারই সম্মুখে বাদশাহ্ জনৈক বিদ্রোহীকে ডাঁট-দাপট ও তিরস্কার করিলেন এবং তাহার মধ্যে যেসকল অপরাধ বিদ্যমান আছে, সেসমস্ত অপরাধের উল্লেখ করিয়াও বিদ্রোহী লোকটিকে তিরস্কার করিলেন। ইহা শুনিয়া মর্যাদাশালী লোকটিরও সতর্ক হওয়া উচিত। হাঁ, এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, অপরাধ লঘু হইলে অসন্তোষ কম এবং গুরুতর হইলে অসন্তোষ অধিক হইবে।

পাপী মুসলমান কাফেরের চেয়ে উত্তম ঃ অবশ্য মুসলমানের পাপ যত গুরুতরই হউক, তাহা কখনও কাফেরের সমতুল্য হইতে পারে না। ইহা ধ্রুব সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান পাপী ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না; কিন্তু ইহাতে কাহারও সান্ত্বনা গ্রহণ করা উচিত নহে যে, আমার প্রতি তো অসন্তুষ্টি কম আছে। দেখুন, এক অপরাধীর ১০ বৎসরের এবং অপর অপরাধীর

www.BANGLAKITAB.com

৫ বৎসরের দণ্ডাদেশ হইল। অল্পমেয়াদী দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি নিশ্চিন্ত হইবে? আমার ধারণা, কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিই অপর অপরাধী অপেক্ষা তাহার দন্ডাদেশ তুলনামূলক কম হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবে না। এখানে একটি সূক্ষ্ম কথা ইহাও আছে যে, কোন কোন সময় বড় ধারা এবং গুরুতর দণ্ডাদেশ শ্রবণে তত মনঃকষ্ট হয় না—ক্ষুদ্র ধারা এবং লঘু দন্ডাদেশ শুনিয়া যত কষ্ট হইয়া থাকে। কেননা, গুরুতর অর্থাৎ, দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডাদেশে অপরাধীর মনে নৈরাশ্য আসিয়া পড়ে এবং ইহা প্রসিদ্ধ কথা, اَلْيَأْسُ اِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ "নৈরাশ্যও দ্বিবিধ শান্তির মধ্যে একটি।"

কথিত আছে, কোন এক অপরাধীকে বিচারক ৭ বৎসরের দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়া বলিলেনঃ "দেখ তুমি আপীল করিও না, অন্যথায় তোমার শাস্তি আরও অধিক হইবে, আমি শাস্তি কমই দিলাম।" কিন্তু সে তাহা অমান্য করিয়া আপীল করিলে সম্ভবত তাহার প্রতি ২৮ বৎসর জেল ভোগের আদেশ হইল। এই গুরুতর দণ্ডাদেশ শ্রবণে তাহার মনে এই ভাবিয়া পূর্ণ নৈরাশ্য আসিল যে, এখন আর জেল হইতে জীবিত প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নাই এবং নৈরাশ্যের দরুন তাহার অন্তরে এক প্রকার শান্তি আসিল।

এই হিসাবে পাপী মুসলমান লঘু শাস্তির কথা শুনিয়া অধিক চিন্তিত হওয়া উচিত। কেননা, সে নিরাশও হইতে পারিবে না। মোটকথা, যদিও শাস্তির গুরুত্ব এবং লঘুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পাপী মুসলমান কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু নৈরাশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে লঘু শাস্তি তাহাদের পক্ষে অধিক চিন্তার কারণ। আমি ইহা এই জন্য বর্ণনা করিলাম, যেন পাপী মুসলমান কাফের অপেক্ষা লঘু শাস্তির উপযোগী হইবে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত না হয়। অধিকাংশ মানুষ এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হয় যে, অবশেষে একদিন দোযখ হইতে অবশ্যই মুক্তি পাইব। লঘু শাস্তির কথা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া বড় ভুল। ফলকথা, কাফের এবং পাপী মুসলমানের শাস্তির ব্যবধান অনস্বীকার্য। কিন্তু এই ব্যবধান কোন মুসলমানকে নিশ্চিন্ত করিতে পারে না; বরং কাফেরদের চেয়ে অধিক হউক, সমান হউক কিংবা কম হউক, চিন্তা মনে থাকিতেই হইবে।

আখেরাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার শাস্তিঃ কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মুসলমানগণ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছে, কতক লোক তো আদৌ চিন্তা করে না। তাহাদের সম্বন্ধে আর কি বলিব? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন জ্ঞানবান লোকও এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেনঃ শাস্তি হইলেও কাফেরদের সমান তো আর হইবে না। আপনদের মন হইতে এই নিশ্চিন্ততা দূর করার উদ্দেশ্যেই আমি এই সমস্ত বর্ণনা পেশ করিতেছি যে, এই কল্পনা আপনারা কখনও হৃদয়ে স্থান দিবেন না। আর এই প্রতিবাদের উত্তর দিতেছি যে, ইহা শুধু কাফেরদেরই উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়াছে, আমাদের আবার চিন্তা কিসের?

উত্তরের সারমর্ম হইল এই যে, যেসমস্ত দোষের কারণে কাফেরদিগকে এই শাস্তির ধমক প্রদান করা হইয়াছে, সেই শ্রেণীর কোন দোষ আপনাদের মধ্যে থাকিলে অবশ্যই আপনাদের চিন্তিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, আর একটি কথা স্মরণ রাখুন, চামারকে চামার বলিয়া দশ জুতা মারিয়া দিলে তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। কিন্তু যদি কোন মর্যাদাসম্পন্ন সম্মানী লোককে এই জাতীয় কথাও বলা হয়, উহা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই লজ্জার বিষয়। এইরূপে কাফেরদিগকে যদি আল্লাহ্‌র দর্শনলাভে অবিশ্বাসী, পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত বা নিদর্শনসমূহের প্রতি অমনোযোগী বলা হয়, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের

www.BANGLAKITAB.com

মধ্যে যদি এ জাতীয় দোষ দেখা যায় এবং তদ্দরুন তাহাদিগকে ঐসমস্ত দোষে দোষী বলা হয়, তবে ইহা নিতান্ত লজ্জার কথা। আরও দেখুন, যদি কোন একজন ভদ্র ও বিশিষ্ট লোককে কোন এক মেথরানীর সহিত বন্দী করিয়া জেলখানার এক কামরায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তবে উক্ত ভদ্র লোকের জন্য কতই না লজ্জার কথা। স্মরণ রাখিবেন, দোযখ বিশেষ করিয়া কাফেরদের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় কাফেরদের স্বভাব ও কার্য অবলম্বন করিয়া مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কাজে-কর্মে ও স্বভাবে যে সম্প্রদায়ের হয়, সে উক্ত সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয় এবং সেই সম্প্রদায়েরই সঙ্গে কয়েদখানায় আবদ্ধ হওয়ার উপযোগী হয়।

تَشَبُّهْ -এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে উল্লেখিত تَشَبُّهْ -কে আজকাল লোকে একেবারেই উড়াইয়া দিয়াছে। যদি কিছু থাকিয়া থাকে তবে তাহা কেবলমাত্র পোশাকে আছে বলিয়া মনে করে। অনেক নির্ভরযোগ্য লোক এই ভুল ধারণায় আছেন যে, ধরন-করণ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বীনদার-পরহেযগারের ন্যায় করিয়া নিজেকে পরহেযগার শ্রেণীভুক্ত মনে করেন—কার্য-কলাপ যাহাই হউক না কেন। কিন্তু এই ব্যাপারে এরূপ মনোভাবের দৃষ্টান্ত অবিকল এই ঃ

একবার এক বহুরূপী বৃদ্ধের সাজ পরিয়া পুরস্কার পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিলে মজলিসের এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, আল্লাহ্‌র দরবারে এসমস্ত বহুরূপীর কি অবস্থা হইবে? কখনও বা স্ত্রীলোকের সাজ গ্রহণ করে, কখনও বা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্য কোন বেশ পরিধান করে। বহুরূপী উত্তর করিল ঃ আমরা কি এসমস্ত পোশাকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যাইব? সেখানে মৌলবীদের পোশাক পরিয়া যাইব, তৎক্ষণাৎ আমাদের মাগ্‌ফেরাত হইয়া যাইবে। আমি ধমক দিয়া তাহাকে বলিলাম ঃ কি বাজে বকিতেছ? আল্লাহ্‌কে কেহ কি ধোঁকা দিতে পারে? আমাদের ঠিক একই অবস্থা, আলেম, ফাযেল এবং নেককারের আকৃতি ধারণ করি বটে; কিন্তু ভিতর শত শত নোংরামিতে পরিপূর্ণ। কবি বলেন ঃ

از بروں چوں گور کافر پر حلل ــ واندروں قهر خدائی عز و جل
از بروں طعنه زنی بر بایزید ــ وز درونت ننگ میدارد یزید

"কাফেরের সমাধির ন্যায় তোমার বাহির জাঁকজমকপূর্ণ সাজে সজ্জিত, কিন্তু অভ্যন্তরে মহা-শক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার দারুণ ক্রোধ রহিয়াছে। তোমার বাহ্যিক অবস্থা হযরত বায়েযীদের (রঃ) ন্যায় মহাতাপসকেও হার মানায়। কিন্তু তোমার অভ্যন্তরস্থ কু-প্রকৃতি ও নোংরা স্বভাব ইয়াযীদকেও লজ্জিত করে।" আমাদের মধ্যে বহিরাকৃতির দরবেশ অনেক আছেন, কিন্তু স্বভাব-চরিত্রের দরবেশ খুবই কম।

ফলকথা, এই হাদীসটি শুধু আকৃতি এবং পোশাকের জন্যই খাছ (নির্দিষ্ট) নহে; বরং প্রত্যেক অবস্থার জন্যই ব্যাপক। মানুষ এই হাদীস সম্পর্কে অনর্থক বুলি আওড়াইয়া থাকে। তাহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, হাদীসটি নিতান্ত যুক্তিপূর্ণ। বিশিষ্ট ও সাধারণ সর্বপ্রকার লোকই ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। দেখুন, কোন ব্যক্তি বৃথা ও অনর্থক কথা বলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে বলা হয় ঃ "তুমি চামার হইয়া গিয়াছ" কিংবা কোন ব্যক্তি সদা-সর্বদা নপুংসক লোকদের মধ্যে অবস্থান করিতে থাকিলে তাহাকে নপুংসকদের মধ্যেই গণ্য করা হয়। ব্যাপার

www.BANGLAKITAB.com

যখন এরূপ, তখন আমরাও কাফেরদের স্বভাব এবং কার্যকলাপ অবলম্বন করিলে তাহাদের সদৃশ এবং সমতুল্য হইয়া যাইব এবং তাহাদের সঙ্গে আমাদিগকে দোযখেও যাইতে হইবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ "খোদা, আমি তোমার নিকট বেহেশ্‌তের প্রার্থনা করিতেছি এবং দোযখ হইতে 'পানাহ্' চাহিতেছি।" অন্যথায় দোযখের সহিত মু'মিন লোকের কোন সম্পর্ক নাই।

বেহেশ্‌ত যেমন পরহেযগার লোকদের জন্য নির্দিষ্ট, তদ্রূপ দোযখও কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট। মধ্যবর্তী একদল লোক কাফেরও নহে পরহেযগারও নহে, তাহারা কাফেরদের ন্যায় প্রথমবারেই বেহেশ্‌তেও যাইবে না; কিন্তু ঈমানে পরহেযগার লোকের সদৃশ বলিয়া কিছুকাল দোযখে শাস্তি ভোগের পর বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবে। অতএব, ঐসমস্ত লোক বেহেশ্‌তে গমনের উপযোগী হইবে যাহারা পরহেযগার অথবা পরহেযগারসদৃশ; অন্যথায় নহে। অবশ্য যাহারা পরহেযগার নহে; বরং পাপী মু'মিন, তাহারা পাপ হইতে যখন পাক-ছাফ হইয়া যাইবে, তখন বেহেশ্‌তে গমনের উপযোগী হইবে। যেমন, চেরাগের গায়ে গাদ জমিয়া মরিচা ধরিলে আগুনে পোড়াইয়া উহাকে পরিষ্কার করা হয়। তৎপর উহা পবিত্র স্থানে ব্যবহারের যোগ্য হয়। এইরূপে পাপী মুসলমানকে দোযখের আগুনে পোড়াইয়া পরিষ্কার করা হইবে। তখন তাহারা বেহেশ্‌তের যোগ্য হইবে।

দোযখে শাস্তিদান ও পবিত্রকরণ ঃ পাপী মু'মিনকে দোযখের আগুনে পবিত্র করার আর একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লউন। শিশু যদি মলমূত্রে লিপ্ত হইয়া যায় তখন বলা হয়, ইহাকে গোসলখানায় নিয়া ভালরূপে রগ্‌ড়াইয়া আন, তাহার শরীরের ময়লা ছাঁচিয়া পরিষ্কার কর। এইরূপে দোযখকেও গোসলখানা মনে করুন। কিন্তু গোসলখানার রগ্‌ড়ান বরদাশ্‌ত হইলেও দোযখের রগ্‌ড়ান, ছাফাই এবং পরিষ্কার করা কখনও বরদাশ্‌ত করা যাইবে না। ফলকথা, কাফেরদের সহিত সামঞ্জস্য থাকার দরুনই পাপী মুসলমান দোযখে যাইবে। প্রভেদ শুধু এতটুকু যে, কাফেরদিগকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে দোযখে অনন্তকালের জন্য পাঠান হইবে, আর মুসলমান পাপীকে পাক-ছাফ করার উদ্দেশ্যে; কিন্তু কষ্ট ও যন্ত্রণা অবশ্যই হইবে। দেখুন, হাম্মামখানায় যখন ঝামা দ্বারা ঘষা হয় তখন কেমন কষ্ট হয়! অতএব, "পরিষ্কার করার জন্য দোযখে দেওয়া হইবে" কথায় পাপী মুসলমানের কি লাভ হইল? দোযখে প্রবেশ করিতেও হইল, যন্ত্রণা এবং কষ্টও ভোগ করিতে হইল। মনে করুন, এক ব্যক্তির দেহে যদি ছুরি ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, আর এক ব্যক্তির শরীরে সূঁই বিঁধাইয়া দেওয়া হয়, তবে আর একজনের কষ্ট অধিক দেখিয়া সে নিজের অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট নিশ্চিন্ত মনে কি সহ্য করিতে পারিবে? কখনও না। আমরা দোযখের সেই কঠিন শাস্তি কেমন করিয়া বরদাশ্‌ত করিব? ছুরিকার অগ্রভাগের সামান্য আঁচড় কিংবা সূক্ষ্ম শলাকার সামান্য জখমও সহ্য করিতে পারি না। সুতরাং পাপী মু'মিনের মনে এই ভাবিয়া সান্ত্বনা গ্রহণ করা উচিত নহে যে, তাহাদের শাস্তি কাফেরদের চেয়ে লঘু হইবে।

যেমন, আবু তালেব সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, দোযখে তাঁহার শাস্তি সর্বাধিক লঘু হইবে। যেহেতু তিনি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজীবন যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার হেক্‌মত ও কৌশলের উপর কোরবান হউন, আবু তালেব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত ভালবাসিতেন, অথচ অন্তিম মুহূর্তে 'কালেমা' পড়া তাঁহার

www.BANGLAKITAB.com

ভাগ্যে হইল না। মৃত্যুকালে কালেমা উচ্চারণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু খোদা আবু জাহ্‌লের বিনাশ করুন, দুরাচার তখনও তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিল। অবশেষে ঈমানবিহীন অবস্থায়ই তাঁহার জীবনের অবসান ঘটিল। এই ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যেহেতু ইহা হইতে একটি মাসআলা বাহির করা উদ্দেশ্য ছিল, কাজেই বর্ণনা করিলাম।

মহব্বত প্রকাশ করা নাজাতের জন্য যথেষ্ট নহেঃ আমি যে মাসআলা বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছি তাহা হয়তো আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন। আজকাল মানুষ শুধু ওয়াযের মজলিস কিংবা মীলাদের মাহ্‌ফিলের অনুষ্ঠান করাকেই নাজাতের কারণ মনে করিয়া থাকে এবং বলে, আল্লাহ্ ও রাসূলের সহিত আমাদের যথেষ্ট মহব্বত আছে। ইহাকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করিয়া থাকে। নামাযেরও প্রয়োজন মনে করে না, রোযারও না, হজ্জেরও না এবং মাগফেরাত প্রার্থনারও না। ইহার জন্য শিক্ষিত লোকগণই অধিক দায়ী। তাঁহারা নিজেদের লোভ-লালসা চরিতার্থকরণের নিমিত্তই এই প্রথা জারি করিয়াছেন। সর্বসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে মজলিসে এমন বিষয়বস্তু অবলম্বনে ওয়ায করিয়া থাকেন যে, ছাহেবান! দাড়ি কামান, নাচ-গান করুন, বাজনা বাজান কিছু ক্ষতি নাই, সব মাফ হইয়া যাইবে; কিন্তু হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহব্বত রাখুন। আর ঐ অবিশ্বাসী ওয়াহাবীদের মজলিসে বসিবেন না। ইহারা ওয়াহাবী নাম দিয়া থাকে সত্যিকারের সুন্নী সম্প্রদায়কে, যদিও তাঁহারা যথারীতি হানাফী মযহাবের মুকাল্লেদ। ওয়াযের মজলিসে তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, "যাহা ইচ্ছা কর, পরোয়া নাই। কিন্তু কেবল আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি মহব্বত রাখ।" সর্বসাধারণের উপর ইহার ক্রিয়া এই হইয়াছে যে, তাহারা সমস্ত আমলকে অনাবশ্যক মনে করিয়া লইয়াছে। এই সমস্ত লোকের আবু তালেবের ঘটনা হইতে বুঝিয়া লওয়া উচিত—আজকাল যত লোকই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মহব্বতের দাবী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাহারও মহব্বতই আবু তালেবের সমকক্ষ নহে। আবু তালেব ঐ ব্যক্তি, যিনি কোরাইশ সম্প্রদায়ের সকলে হুযূর (দঃ)-এর সঙ্গ-সহায়তা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন এবং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষপাতিত্বের দরুন যথেষ্ট কষ্ট সহিয়াছিলেন। আজকাল তো আমাদের অবস্থা এইরূপ, শরীঅতে মোহাম্মদীর বিরুদ্ধাচণের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাই। মৌখিক মহব্বতের দাবীদারের মহব্বতের দৌড় নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিবেন—

এক মজলিসে ইমাম বংশের উপর ইয়াযীদের অত্যাচার কাহিনী বর্ণিত হইতেছিল। শ্রোতাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "দুঃখের বিষয় তখন আমি ছিলাম না, নচেৎ এরূপ করিতাম, ঐরূপ করিতাম ইত্যাদি।" এই ভণ্ডামি দেখিয়া গ্রাম্য সাদাসিধা এক লোক উত্তেজিত হইয়া বলিলঃ "আমি বলি, আমি ইয়াযীদ। আমি এরূপ করিয়াছি, ঐরূপ করিয়াছি, সাহস থাকিলে আস।" ইহা শুনিতেই উক্ত বাহাদুর ব্যক্তি ঘাবড়াইয়া গেল। আজকালকার মহব্বতে রাসূলের দাবীদারগণের অবস্থাও এইরূপ মনে করিবেন।

অতএব, দেখুন, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে আবু তালেবের এত অনুপম মহব্বত ছিল, শুধু মহব্বতের দাবী নহে; বরং সত্যিকারের মহব্বত। এতদ্‌সত্ত্বেও এই মহব্বত তাঁহাকে দোযখ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। কেননা, মহব্বত নেড়া ছিল, তৎসঙ্গে আনুগত্য ছিল না। আজকালকার দাবীদারগণ তো অত খাঁটি মহব্বতেরও দাবী করিতে পারে না। যদি করেও, তবে স্মরণ রাখিবেন, وَجَائِزَةٌ دَعْوَى الْمَحَبَّةِ فِى الْهَوٰى - وَلٰكِنْ لَّا يَخْفٰى كَلَامُ الْمُنَافِقِ

www.BANGLAKITAB.com

"মহব্বতের মৌখিক দাবী করা অবিধেয় নহে। কিন্তু মোনাফেকের কথা আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না।" আমি বলি, মহব্বতের সহিত হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্বন্ধে আলোচনা কর। কিন্তু নিয়মমত আলোচনা কর। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-ও হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্বন্ধে তাঁহাদের অবস্থা সর্বদা এইরূপ ছিলঃ

ما هرچه خوانده ايم فراموش كرده ايم ـ الا حديث يار كه تكرار مى كنيم

"আমরা যাহাকিছু পড়িয়াছি, ভুলিয়া গিয়াছি, কেবল দোস্তের আলোচনা ভুলি নাই, তাহা প্রতিমুহূর্তে আমাদের ওযীফা হইয়া রহিয়াছে।" তাঁহারা প্রতিমুহূর্তে হুযূর (দঃ)-এরই আলোচনা করিতেন। যেমন, মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব বলিতেনঃ "আমরা তো প্রত্যেক সময়ই মীলাদ পড়িয়া থাকি। অর্থাৎ, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ পাঠ করি। এই কালেমা তাইয়্যেবার মধ্যেও তাঁহারই আলোচনা হইয়া থাকে। হুযূর (দঃ)-এর স্মরণ আমাদের হৃদয়ে সকল সময়ই বিরাজমান, মুখে ও হাতে আমরা সর্বদা হুযূরের স্মরণে নিয়োজিত আছি।" সোব্‌হানাল্লাহ্‌! কেমন সুন্দর জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়াছেন যে, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) প্রতিনিয়ত হুযূর (দঃ)-এর আলোচনা করিতেন। নিছক আলোচনাই করিতেন না; বরং হুযূরের যেসমস্ত গুণাবলী আলোচনা করিতেন তদ্রূপ নিজদিগকে গঠন করারও চেষ্টা করিতেন। আজকাল যে ধরনের 'মীলাদ' প্রচলিত হইয়াছে, ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ইহার নামগন্ধও ছিল না। কোন ছাহাবী কোন সময় মিঠাই বা বাতাসা-জিলিপী বিতণ করেন নাই। কখনও মীলাদের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করেন নাই। কেহ যদি বলেনঃ "আমরা তো আনন্দে মিঠাই বিতরণ করিয়া থাকি।" আমি তদুত্তরে বলিবঃ "দৈনিক কেন বিতরণ করেন না?" এক বিশেষ মজলিস জমাইয়া তাহাতে কেন বিতরণ করা হয়? এইরূপ 'কিয়াম'ও। এ সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য—এই নির্দিষ্ট মজলিসে নির্দিষ্ট সময়ে দাঁড়াইয়া পড়ার কারণ কি? এখন যে হুযূরের আলোচনা চলিতেছে, এখন কেহ দাঁড়ান না কেন? স্মরণ রাখিবেন, ইহা পয়সা উপার্জনকারীদের মনগড়া আবিষ্কার। মজলিসের প্রত্যেকটি অংশকে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে তৈয়ার করিয়া লইয়াছেন, যাহাতে মানুষ প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী থাকে। যখনই জনসাধারণ তাঁহাদের দ্বারা উক্ত কার্যের অনুষ্ঠান করিবে, তখনই তাঁহাদিগকে কিছু দান করিবে। আবার যখন ওয়ায়েয ছাহেব কিছু পাইলেন, তখন মজলিসে যোগদানকারীদেরও কিছু পাওয়া উচিত। এই কারণে মিঠাই বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

লোকে আরবের দস্তুর ও প্রথা দ্বারা এসমস্ত বিষয় প্রমাণ করিতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহারা জানে না যে, আরব দেশে কোন্ পদ্ধতিতে মীলাদ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যদিও আরব দেশের অধুনা প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানে কিছু ন্যূনাধিক্য আছে, তথাপি আমাদের দেশের তুলনায় তথাকার অনুষ্ঠান যথেষ্ট অনাড়ম্বর ও সরল। মিঠাই বিতরণ করা হয় সত্য, কিন্তু উহার অবস্থা এই যে, অর্ধ মজলিসে বিতণের পর শেষ হইয়া গেলে বিনা দ্বিধায় বলা হয়—'খালাছ'। অর্থাৎ, শেষ হইয়া গিয়াছে। আচ্ছা! এদেশে কেহ এরূপ মজলিস করিয়া দেখান তো? কসম করিয়া বলিতেছি, এখানে মীলাদের নামে যাহাকিছু হইতেছে সবকিছুই 'ফখর' বা আড়ম্বর প্রকাশের জন্য বটে।

ঈসালে সওয়াবের সহজ পন্থাঃ বন্ধুগণ! মহব্বতের রকমই স্বতন্ত্র। শাহ্ আবদুর রহীম ছাহেব দেহ্‌লবী প্রতিবৎসর রবিউল আউয়াল মাসে কিছু খাদ্য প্রস্তুতকরত বিতরণ করিতেন। একবার

www.BANGLAKITAB.com

তিনি কোন খাদ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন না, অগত্যা যৎকিঞ্চিৎ ছোলা ভাজাইয়া বিতরণ করিলেন। পরবর্তী রাত্রেই স্বপ্নে দেখিলেন, হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ছোলা ভাজা খাইতেছেন। দেখুন, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণই মহব্বত করিতে জানেন, তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করুন এবং তাঁহাদের অনুসৃত পথে চলুন।

আমি ঈসালে সওয়াবের সহজ পন্থা বলিয়া দিতেছি; কিন্তু সেই পন্থা নফ্‌সের পছন্দ হইবে না। তাহা এই যে, যাহাকিছু দান-খয়রাত করিতে ইচ্ছা করেন; গোপনে করিবেন। রবিউল আউয়াল মাসে ৫০ পঞ্চাশ টাকা খয়রাত করুন, কিন্তু কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। এক টাকা করিয়া এক একজন মিস্‌কীনকে দান করুন। যদি বাস্তবিক হুযূরের প্রতি সত্যিকারের মহব্বত থাকে, তবে এই পন্থায় আমল করুন। কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, এরূপ কখনও পারিবেন না। নফস কুমন্ত্রণা দিবে—"মিঞা! ৫০ টাকা খরচ হইল, অথচ কেহই জানিতে পারিল না।"

আজকাল তো মীলাদ মাহ্‌ফিলের অবস্থা এই পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, আমি কানপুরে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি আসিয়া মীলাদ পাঠের জন্য আমাকে দাওয়াত করিয়া লইয়া গেল। আমি যথাসময়ে হুযূরের মীলাদ ও অন্যান্য আখলাক্ সম্বন্ধে ওয়ায সমাধা করিয়া আসিলাম। পরবর্তী দিন জানিতে পারিলাম, সেই মঞ্চে বাইজী কর্তৃক নাচ-গান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, সে বাড়ীতে বিবাহের উৎসব ছিল। তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল নাচ-গানের অনুষ্ঠান করা। কিন্তু কোন কোন সৎভাবাপন্ন বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে মীলাদেরও আয়োজন করিয়াছিলেন। অতএব, বুঝিতে পারেন, এই মীলাদের ব্যবস্থা হুযূরের মহব্বতের কারণে ছিল না; বরং বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছিল। আরও মজার কথা এই যে, মীলাদ অনুষ্ঠান নাচ-গানের সঙ্গে সমান তালে একই মঞ্চে করা হইয়াছিল।

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُ তথাপি লোকে বলে, আমাদের হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মহব্বত আছে, আমরা তাঁহার অনুরক্ত।

কানপুরে থাকাকালে আমার কানে আসিত, "অদ্য অমুক বেশ্যা বাড়ীতে মীলাদের মজলিস হইবে, আজ অমুক বেশ্যালয়ে হুযূরের জীবনী অবলম্বনে বক্তৃতা হইবে।" দুঃখের বিষয়, এ সমস্ত এলাকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় 'যেনা' সম্বন্ধীয় ওয়ায কেহই সেখানে করে না। নিছক রাসূলের জীবনী আলোচনায় কি ফল হইবে? দেখুন, দস্তরখানে যদি শুধু চাট্‌নী রাখা হয়, তবে কেবল ইহা ভক্ষণে কাহারও তৃপ্তি হইতে পারে কি? কখনই না; বরং চাট্‌নী না দিয়া যদি শুধু খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয় তথাপি তাহাতে কাজ চলিতে পারে। অবশ্য উভয় বস্তু একত্রে দেওয়া হইলে—

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ 'আলোর উপর আলো' অর্থাৎ, অতি উত্তম হয়।

এই প্রসঙ্গে এতগুলি কথা বলিলাম যে, মানুষ মহব্বতের দাবী করিয়া থাকে; কিন্তু কাজ করে উহার বিপরীত এবং মহব্বতের দাবী করিয়াই পরিত্রাণ পাইবার আশা পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা একবার আবু তালেবের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুক, তাঁহার পরিণাম কি হইবে। অবশ্য অন্যান্য কাফেরের তুলনায় তাঁহার শাস্তি অনেক লঘু হইবে। হুযূর (দঃ)-এর বদৌলতে আবু তালেবের পায়ে কেবল একজোড়া আগুনের জুতা পরিহিত থাকিবে। কিন্তু ইহাও এমন যন্ত্রণাময় হইবে যে, তিনি মনে করিবেন, আমার চেয়ে অধিক কষ্ট বোধ হয় কেহই ভোগ করিতেছে না।

www.BANGLAKITAB.com

দুনিয়াতেই দেখুন, কাহারও পায়ে যদি একটা বাবুলের কাঁটাও বিঁধে, তাহার অবস্থা কেমন হইয়া থাকে ? অতএব, যদি কেহ মনে করেন যে, কাফেরদের চেয়ে আমার শাস্তি তুলনামূলক লঘু হইবে, তবে তিনি ভাল করিয়া চিন্তা করুন, দোযখের লঘু শাস্তিও বরদাশ্‌ত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং কাহারও এরূপ ধোঁকায় পতিত থাকা উচিত নহে যে, "আমার শাস্তি অপেক্ষাকৃত লঘু হইবে।" আশা করি, আমার এই দীর্ঘ আলোচনায় আপনাদের অলীক সন্দেহের অবসান ঘটিয়াছে।

নিশ্চিন্ত থাকার পরিণতি ঃ এখন ঐসব আলোচ্য আয়াতে তিরস্কার ও নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "যাহারা মৃত্যুর পরে আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে বলিয়া বিশ্বাস করে না।" অবশ্য এই অবিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। কেননা, আমরা তো তাহা বিশ্বাস করি, কিন্তু ইহাতেও নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নাই। কারণ, এই দোষ না থাকার কারণে শাস্তি লঘু হইবে বটে ; কিন্তু শাস্তি তো নিশ্চয়ই হইবে। অতঃপর আরও দোষের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غَافِلُوْنَ ○

"আর যাহারা পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হইয়া উহাতে নিশ্চিন্ত রহিয়াছে এবং যাহারা আমার নির্দেশ -সমূহ হইতে অমনোযোগী।" আয়াতে মোট চারিটি দোষের উল্লেখ করিয়া উহার প্রতিফলস্বরূপ বলা হইয়াছে ঃ أُولٰئِكَ مَاْوٰهُمُ النَّارُ "তাহাদের ঠিকানা দোযখে।" এই শোচনীয় পরিণতি হইতে বুঝা গেল যে, এই চারিটি দোষের শাস্তি এমন জঘন্য, যাহা বড়ই নিন্দনীয় এবং দূষণীয়। কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, 'সমষ্টিগতভাবে চারিটি দোষের পরিণামই শোচনীয়। আমাদের মধ্যে তো সমবেতভাবে সবগুলি দোষ নাই। কেননা, আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস রাখি। সুতরাং এই বিশ্বাস না করার দোষ আমাদের মধ্যে নাই!' আসল কথা এই যে, প্রথমতঃ সমষ্টিগতভাবে চারিটি দোষের এই পরিণাম হওয়ার কোন দলিল নাই। সংযোজক অব্যয় 'و' ব্যবহার করিয়া এক বাক্যে কতকগুলি বস্তু বা বিষয় একত্র করা হইলে সমষ্টি না বুঝাইয়া কোন কোন সময় পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটিকেও বুঝায়। এতদ্ভিন্ন সম্ভাবনার উপর নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যদি ইহা মানিয়াও লওয়া হয়—তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাফেরদের দোষ উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়া শুধু 'আল্লাহ্‌র দর্শনলাভে অবিশ্বাসী হওয়ার' দোষ বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; বরং আরও কয়েকটি দোষেরও উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ্যে বুঝা যায় যে, শেষোক্ত দোষগুলি অনর্থক উল্লেখ করা হয় নাই। যদি পৃথকভাবে উক্ত শাস্তিতে ইহাদের কোন দখল না থাকে, তবে অনর্থকতা সাব্যস্ত হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটি দোষেরই উক্ত পরিণামে দখল আছে। কাজেই পৃথকভাবে প্রত্যেকটি কার্যই নিন্দনীয় এবং দূষণীয় বটে। ইহার কোন একটি কাহারও মধ্যে থাকিলে তাহাকে নিষ্পাপ বলা যাইবে না। এই চারিটি দোষের প্রথমটি হইতে আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা নিশ্চয়ই মুক্ত আছি এবং শেষোক্ত দোষটি, অর্থাৎ, আল্লাহর আহ্‌কাম ও নির্দেশাবলী হইতে অমনোযোগী থাকা, আমাদের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। কেননা, অমনোযোগিতা দুই প্রকার। (১) বিশ্বাসের অভাবে অমনোযোগী হওয়া এবং তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। আমরা নিশ্চিতভাবে ইহা হইতে মুক্ত আছি। (২) সাধারণ অমনোযোগিতা, ইহাতে আমরা অবশ্যই লিপ্ত আছি।

www.BANGLAKITAB.com

সন্তুষ্টি ও নিশ্চিন্ততার প্রভেদঃ মধ্যবর্তী দুইটি দোষে আমরা অবশ্যই লিপ্ত আছি। এই দুইটি একই বটে, তবে সামান্য প্রভেদ আছে। কেননা, সন্তুষ্টি জ্ঞানপ্রসূত আর নিশ্চিন্ততা স্বভাবোদ্গত। কোন সময় কোন বস্তুকে জ্ঞান পছন্দ করে; কিন্তু স্বভাবত উহা চিত্তাকর্ষক নহে। যেমন, তিক্ত ঔষধ রোগ নিরাময়ের জন্য কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় শহীদ হওয়ার জন্য অগ্রসর হওয়া পছন্দনীয় বটে, কিন্তু স্বভাব উহাকে পছন্দ করে না। আবার কোন সময় দেখা যায়, কোন বস্তু স্বভাবত পছন্দনীয় ও লোভনীয়; কিন্তু জ্ঞান উহাকে পছন্দনীয় মনে করে না। যেমন 'যেনা' প্রভৃতি। মোটকথা, কোন ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি আসে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আবার কোন সময় নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কিন্তু সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। কিন্তু যেই অবস্থায় সন্তুষ্টি এবং নিশ্চিন্ততা একত্রিত হয় তাহা বড়ই কঠিন অবস্থা, কাফেরগণ ব্যাপকভাবে এই অবস্থার অধীন; বরং অধিকাংশ মুসলমানও ইহাতে নিমজ্জিত।

যেক্ষেত্রে দ্বীন এবং দুনিয়ার স্বার্থে বিরোধ দেখা যায়, যেমন মিথ্যা মোকদ্দমা, ঘুষ গ্রহণ, পরের যমীন জবর দখল ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়কে পাপ বলিয়া সকলেই জানে, তথাপি মনে মনে পছন্দ করে, খারাপ মনে করে না; বরং তাহা সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হইলে বলিয়া থাকে, ইহা গভর্ণমেন্টের আইনের ব্যাপার, উপদেষ্টা কি বুঝিবে? ফলকথা, জ্ঞানত তাহারা ইহা পছন্দ করে এবং প্রাধান্যও দেয়। হয়তো বিশ্বাস এরূপ নহে, অনুরূপ অবস্থা এল্‌ম শিক্ষার ব্যাপারেও। তাহারা জানে—প্রাথমিক স্তরে শিশুকে আধুনিক শিক্ষায় লিপ্ত করিলে ধর্ম সম্বন্ধে শিশুরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকিয়া যায়। অথচ জানিয়া-শুনিয়া উহা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে—শৈশব হইতে আধুনিক শিক্ষায় লিপ্ত না করিলে তাহারা জীবনে উন্নতি করিবে কেমন করিয়া? ইহাকেই বলে দুনিয়াতে সন্তুষ্টি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকালকার দস্তুরই এরূপ হইয়াছে যে, আলেম এবং দরবেশগণের মধ্যেও এই রোগ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অথচ তাহাদেরই অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। আমি দেখিতেছি, দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্টির কারণে তাহাদের নীতি এই হইয়াছে যে, মুর্দা বেহেশ্‌তে যাক কিংবা দোযখে যাক, কিছু আসে যায় না, "তাহাদের চাই পয়সা।" ইহারা সেই শ্রেণীর আলেম, যাহাদের কার্যকলাপ ও স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া জনসাধারণ দ্বীনী এল্‌ম হইতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বীনী এল্‌মের অমর্যাদাঃ বন্ধুগণ! দ্বীনী এল্‌মকে আমরা নিজেরাই অপমান করিয়াছি। নচেৎ এককালে ইহার মর্যাদা এত উর্ধ্বে ছিল যে, সকল শ্রেণীর মানুষই ইহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিত। দিল্লীর বাদশাহ্‌র দরবারে কোন আলেম পদার্পণ করিলে স্বয়ং বাদশাহ্ তাঁহার সম্মুখে নত হইয়া পড়িতেন। অন্যান্য শ্রেণীর লোকের তো কথাই নাই, অধীনস্থ রাজ-রাজড়ারা কিংবা জায়গীরদারগণ দরবারে আসিলে বাদশাহ্ চোখ তুলিয়াও তাঁহাদের দিকে তাকাইতেন না। কিন্তু আলেমগণকে দেখামাত্র মাথা নত করিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান জানাইতেন। এখন বলুন, তৎকালীন ওলামায়ে কেরামের নিকট কোন্ বস্তু ছিল? কোন্ রাজ্য ছিল? কেবল এই তো ছিল যে, তাঁহারা আলেম ছিলেন, ধর্মপথের নায়ক ছিলেন। কিন্তু এখন আমরা নিজেরাই যদি নিজেদের অমর্যাদা করি, তবে ইহাতে কাহার কসূর? একই অবস্থা হইয়াছে পীরদের। অতিরিক্ত লোভের বশীভূত হইয়া তাঁহারাও মর্যাদা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

এক গ্রাম্য বর্বরের ঘটনা আমার স্মরণ পড়িল। মৌসুমের শস্য ঘরে আসিলে সে যখন নিম্নশ্রেণীর সেবক পরিচারকদের মামুলী অংশ পৃথক করিতে বসিল, গৃহিণী ও ছেলে-পেলেরা সেবক-

www.BANGLAKITAB.com

পরিচারকদের হিসাব করিতে লাগিল—ধোপা, মালী, পাটনী প্রভৃতি। কৃষক বসিয়া তাহা শুনিতেছিল। সমস্ত নিম্নস্তরের সেবকদের নাম বলা সমাপ্ত হইলে কৃষক বলিয়া উঠিলঃ "কমবখত! পীরের অংশটাও পৃথক করিয়া লও।" এত অবজ্ঞার সহিত যে পীরের মামুলি অংশ পৃথক করা হইল, তিনিও সেই শ্রেণীর পীর। একটি ঘটনা হইতেই তাহাদের সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিবেনঃ 'মাসাবী' মৌজার কতিপয় লোক মঙ্গলৌরের কাজী ছাহেব রাহেমাহুল্লাহ্‌র মুরীদ হইয়াছিল। তাহাদের খান্দানী পীর ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেনঃ "ভাল কথা, আমিও তোমাদিগকে পুল্‌সেরাতের উপর হইতে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিব।" এই শ্রেণীর পীরই এইরূপ অবজ্ঞার পাত্র। অনুরূপভাবে কতক ওলামাও ইত্যাকার অবজ্ঞার উপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোন একজন সাবজজ সেকেলে পোশাক পরিধান করিয়া পুরাতন ভাবধারাযুক্ত কোন এক জায়গায় বদলী হইয়া গেলেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচয়লাভের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া তিনি জনৈক সম্মানী লোকের বাড়ীতে যাইয়া পৌঁছিলেন। গৃহস্বামী দূর হইতে তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াই গৃহের অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। আগন্তুক জনৈক চাকরের সাহায্যে বলিয়া পাঠাইলেন, "বল, আমি জিলার সাবজজ। তোমার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" নাম শুনিয়া ভদ্র লোকটি বাহিরে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেনঃ "মাফ করুন, আপনার আবা কাবা দেখিয়া আমি ধারণা করিয়াছিলাম, কোন মৌলবী ছাহেব চাঁদা আদায়ে আসিয়াছেন।" আজকাল ওলামাদের সম্বন্ধে সর্বসাধারণের এই ধারণা। কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিশেষ দোষ নাই; বরং এই শ্রেণীর আলেমদেরই দোষ, তাহারাই নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা সর্বসাধারণের মনোভাব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা আলেমদেরই ত্রুটি। আলেমগণ যদি এই জাতীয় নীচ ও হীন কার্যকলাপ হইতে দূরে থাকিত, তবে সাধারণ লোক তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবার সাহস পাইত না।

এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষার প্রতি উৎসাহদানঃ যাহারা এই শ্রেণীর অর্বাচীন আলেমদিগকে দেখিয়া এল্‌মে দ্বীন হইতে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহারাও ভুল করিয়াছে। দ্বীনী এল্‌মের সাথে সাথে সন্তানদিগকে উচ্চাঙ্গের আদব-কায়দাও শিক্ষা দিতে পারিত, তাহা হইলে সন্তানদের অসঙ্গত ও অশোভন স্বভাবের উৎপত্তিই হইত না। দ্বিতীয়ত কোন বংশানুক্রমিক ভদ্র সন্তান যদি দ্বীনী এলম শিক্ষা করে, তবে সে তাহার বংশগত স্বভাবসুলভ উন্নত মনোভাবের দরুন উপরোক্ত নীচ মনের ও হীন স্বভাবের কার্য করিবেই না। বস্তুত অধিকাংশ নীচ বংশের লোকেরাই এমন হীন কার্য করিয়া থাকে। ইহাই যখন আসল ব্যাপার, তখন সন্তানের দ্বীনী তা'লীমের জন্য শিক্ষক নির্বাচনের বেলায়ও এদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আমি বলি না যে, 'সন্তানদের আধুনিক শিক্ষায় লিপ্ত করিবেন না।' আধুনিক শিক্ষা অবশ্যই দিন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চিন্তা করুন যে, ধর্মীয় শিক্ষা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তু, সুতরাং প্রথমে দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অতঃপর অন্যান্য শিক্ষা। ধর্মীয় শিক্ষা প্রথমে দিতে না পারিলেও অন্যান্য শিক্ষার সাথে দ্বীনী তা'লীম দেওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি অন্য শিক্ষার সাথে বিস্তারিতরূপে দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষাদানের সুযোগ বা সময় না হয়, তবে ধর্ম সম্বন্ধীয় উর্দু (বা বাংলা) বইগুলিই পড়ান, কিন্তু তাহা প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট সবকে সবকে পড়িতে হইবে। কিতাব খরিদ করিয়া বলিয়া দিলে চলিবে না যে, "পড়িয়া লও"; বরং কোন দ্বীনদার-পরহেযগার আলেম দ্বারা পূর্ণ কিতাব আদ্যন্ত সবকে সবকে ভালরূপে বুঝিয়া পড়িতে হইবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি ঘন্টা এই শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেই

www.BANGLAKITAB.com

যথেষ্ট হয়; বরং আমি বলি, ছেলে-মেয়েরা দৈনিক যে সময়টুকু খেলাধুলায় নষ্ট করে, উহা হইতে একটি ঘণ্টা ধর্মীয় শিক্ষায় ব্যয় করুন, সময় সময় পরীক্ষা নিন্। কৃতকার্যতার জন্য পুরস্কার এবং অকৃতকার্যতার জন্য শাস্তি দান করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমল করাইবারও চেষ্টা করুন। অঙ্ক ইত্যাদি যেরূপ টাস্ক বা অনুশীলনী দিয়া থাকেন এবং তাহা না করিলে শাস্তি দিয়া থাকেন, তদ্রূপ ধর্মীয় শিক্ষায় প্রত্যেকটি মাসআলা সম্বন্ধে কড়াকড়ি শিক্ষা দিন।

ইহার সুফল এই হইবে যে, আধুনিক শিক্ষালাভের সাথে সাথে ছেলে-মেয়েরা দ্বীনদার-পরহেযগার হইতে থাকিবে। অবশ্য এই শিক্ষার জন্য একজন উপযুক্ত আলেমকে নিযুক্ত করিতে হইবে। ইংরেজী শিক্ষার জন্য শত শত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, ধর্মীয় শিক্ষার জন্য দশ টাকা ব্যয় করিলে এমন কি যুলুম হইয়া যাইবে? আবার উক্ত মৌলবী ছাহেব হইতে আপনি নিজেও জরুরী মাসআলা শিখিয়া উপকৃত হইতে পারেন।

"দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্টি" ব্যাধির ব্যাপকতাঃ প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, এই শহরে পূর্বের ন্যায় দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে ভাল হইত। এখন-কার ছেলেদের কিছু না কিছু এল্‌মে দ্বীন অবশ্যই শিক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। দেখুন, অন্তত দুই ঘণ্টার জন্যও যদি কোন হক্কানী আলেমের সাহচর্য ভাগ্যে জুটে, তবে ছেলেরা শেষ পর্যন্ত দ্বীনদার পরহেযগার না হইলেও ধর্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, এদিকে মানুষের লক্ষ্যই নাই। যদি বলেন, "এই শহরে মৌলবী দুর্লভ।" আমি বলিব, "এই শহরে রাজমিস্ত্রী নাই। আপনাদের প্রয়োজন হইলে অবশ্যই অন্য শহর হইতে আনয়ন করেন। তবে অন্যস্থান হইতে মৌলবী আনয়ন করিতে দোষ কি? এর বেলায় কেন অপেক্ষায় থাকেন, মৌলবী কি নিজেই আপনাদের নিকট আসিবেন?" বন্ধুগণ! যদি আপনাদের অন্তরে ধর্মের কোন গুরুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব থাকিত, তবে ধর্ম শিক্ষার জন্য আপনারা নিজেরাই মৌলবী তালাশ করিতেন।

সারকথা এই যে, দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্টির এই অপকারিতাগুলি হইতে অনেক কম লোকই মুক্ত আছেন। এমন কি তথাকথিত মৌলবী এবং দরবেশগণও ইহা হইতে মুক্ত নহেন। বস্তুত মৌলবী ও দরবেশদের দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্টি বড়ই মারাত্মক। কেননা, তাহারা জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়া দুনিয়া উপার্জন করিয়া থাকেন। অবশ্য প্রত্যেক দলেই কিছুসংখ্যক লোক বাদ আছে। দুনিয়াদার-দের মধ্যেও এবং দ্বীনদারদের মধ্যেও। এই পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অংশটির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সম্মুখের দিকে وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا বাক্যের ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন।

দুনিয়াদার দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং দুনিয়াও তাহাদের অন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এই অনুরাগ তাহাদের অন্তর হইতে দূর করা সুকঠিন। দুনিয়ার প্রতি যৎসামান্য আকর্ষণ টের পাইতেই প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণ আঁৎকিয়া উঠা উচিত। বলুন তো, দুনিয়াতে থাকিয়া কোন্ মুসলমানের প্রাণ দৈনিক কয়বার আঁৎকিয়া উঠিয়াছে? এই জন্য কখন কাহার মনে ভয়ের উদয় হইয়াছে? পক্ষান্তরে আখেরাতের কল্পনায় প্রাণে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। অথচ দুনিয়ার সহিত এতটুকু সম্পর্ক হওয়া উচিত, যতটুকু মুযাফ্‌ফরনগরের মুসাফিরখানার সহিত হইতে পারে। যদিও কার্যো-পলক্ষে জালালাবাদের লোক মুযাফ্‌ফরনগরে গমন করিয়া তথায় যাবতীয় কাজকর্ম সমাধা করে

www.BANGLAKITAB.com

বটে, কিন্তু তাহাদের মন জালালাবাদেই পড়িয়া থাকে। কেহ এ কথার অর্থ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, মৌলবীরা দুনিয়া বর্জন করাইতে চান, সম্পূর্ণ ভুল। হাঁ, মৌলবী ইহা অবশ্যই বলেন যে, দুনিয়ার সহিত মুসাফিরখানার ন্যায় সম্পর্ক রাখুন। দেখুন, আপনারা সফরকালে মুসাফির-খানায় বা হোটেলে খাওয়া-দাওয়াও করেন এবং রাত্রি যাপনের জন্য কামরাও ভাড়া করিয়া থাকেন। কিন্তু তথায় কখনও আপনাদের মন বসে না। অথচ দুনিয়ার সহিত বেশ মন লাগাইয়া বসিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, আপনারা দুনিয়ার স্বরূপ চিনেন নাই। নির্বোধ শিশু মুসাফির-খানার কোন আরামদায়ক অবস্থা বা চিত্তাকর্ষক বস্তু দেখিয়া বায়না ধরে—"আমি বাড়ী যাইব না, এখানেই থাকিব।" দুনিয়ার সহিত যাহারা আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাহাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপই। পক্ষান্তরে যাহারা দুনিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল আছে, কোন কবি তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেনঃ

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم ـ راحت جان طلبم وزپے جاناں بروم
نذر کردم کہ گر آید بسر ایں غم روزے ـ بردر میکدہ شاداں و غزل خواں بروم

"সেইদিন কতই না আনন্দের হইবে, যে দিন আমি এই অস্থায়ী বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইব এবং প্রিয়জনের সমীপে গমন করিয়া আত্মার শান্তি কামনা করিব! (প্রিয়জনের মিলনলাভের পর জীবন অনন্তকাল স্থায়ী হইবে।) আমি মানত করিয়াছি যে, যে দিন এই চিন্তার অবসান ঘটিবে; অর্থাৎ, দুনিয়ার ঝামেলা হইতে মুক্তি লাভ করিব, সেইদিন আনন্দেচিত্তে গান গাহিতে গাহিতে শরাবখানার দ্বারদেশ পর্যন্ত চলিয়া যাইব।"

দেখুন, দুনিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকগণ মানত করিতেছেন—ইহলোক হইতে মুক্তি পাইলে এইরূপ করিবেন।

দুনিয়ার অনুরাগ দূর করিবার উপায়ঃ এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আমার সময় সঙ্কীর্ণ। কাজেই এখন ইহার একটিমাত্র উপায় বলিয়া আমি বিষয়টি সংক্ষেপ করিতেছি। তাহা এত কার্যকরী যে, পীরে কামেলের সংসর্গে থাকিয়া যে ফল লাভ করিতেন, এই উপায়টি অবলম্বনে তাহা সহজে লাভ হইবে। এখন সীমা ডিঙ্গাইয়া বাহিরে পা রাখিতেছেন, এই উপায়ে তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় ঐ অঞ্চলের লোকের মনের অবস্থা যেরূপ হয়, এই উপায় অবলম্বনে আপনাদের অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। অর্থাৎ, দুনিয়ার সমস্ত কাজই করিবেন, কিন্তু কোন কাজের প্রতি মনের আকর্ষণ থাকিবে না। উপায়টি এই—১। প্রত্যহ এক নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুকে স্মরণ করুন। ২। অতঃপর কবরের অবস্থা স্মরণ করুন। ৩। তৎপর হাশরের কথা স্মরণ করুন। ৪। এবং সেই ভয়াবহ অবস্থা ও কষ্ট-মুসীবতের বিষয় চিন্তা করুন। ৫। এবং ইহাও চিন্তা করুন যে, আমাকে মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্ তা'আলার সমক্ষে দাঁড় করান হইবে। ৬। আমার যাবতীয় কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে। ৭। একটা একটা করিয়া সমস্ত হক আদায় করিতে হইবে। ৮। অতঃপর কঠিন আযাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।

এইরূপে প্রতি রাত্রে শয়নকালে চিন্তা করিবেন। ইন্‌শাআল্লাহ্, দুই সপ্তাহের মধ্যে কায়া পরি-বর্তিত হইয়া যাইবে। দুনিয়ার প্রতি যে নিশ্চিন্ত মনোভাব, অনুরাগ এবং আকর্ষণ বিদ্যমান আছে, তাহা লোপ পাইবে।

www.BANGLAKITAB.com

আজিকার ওয়াযে যদিও শরীঅতের শাখা-বিধান বা মাসআলা অধিক বর্ণনা করা হয় নাই, কিন্তু بحمد الله মূলনীতি জাতীয় কথা যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। এখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুন—তিনি আমাদিগকে আমলের তাওফীক দান করুন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَآ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

■

জালালাবাদ শহরের আলী হাসান ছাহেবের মসজিদ
১৩৩০ হিজরী, ১৫ই সফর

www.BANGLAKITAB.com

আল-ইত্‌মীনানু বিদ্‌দুনিয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غَافِلُوْنَ ۙ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

দুনিয়ার অনুরাগই সমস্ত রোগের মূল

যদিও আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের রোগ বা দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হাদীসের প্রমাণে বুঝা যায়, সমস্ত রোগের মূলাধার একটি বস্তু। তাহা দুনিয়ার মহব্বত ছাড়া আর কিছুই নহে। হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার শব্দে বলিয়াছেন—

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ "দুনিয়ার মহব্বতই সমস্ত দোষের মূল।" সুতরাং একটি একটি করিয়া পৃথকভাবে প্রত্যেকটি দোষ বিস্তারিত বর্ণনা করার পরিবর্তে সমস্ত রোগের মূল এবং উহা নিরাময়ের উপায় বর্ণনা করাই সঙ্গত। কেননা, প্রথমতঃ, প্রত্যেকটি রোগের বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের সময় নাই। দ্বিতীয়তঃ, মূল রোগ নিরাময়ের উপায় জানিতে পারিলে উহার সাহায্যে তদধীন প্রায় সবগুলি রোগ নিরাময়েরই উপায় হইয়া যাইবে। মূল রোগটিই অন্যান্য রোগ উৎপন্ন হওয়ার কারণ। অতএব, মূলের চিকিৎসা হইলে তৎকারণে উৎপন্ন সমস্ত রোগেরই চিকিৎসা হইয়া যাইবে। বস্তুত কারণ দূরীভূত করাই প্রকৃত চিকিৎসা!

মৌলিক রোগের চিকিৎসা প্রথম করা উচিতঃ মনে করুন, কাহারও দেহ হইতে অতিরিক্ত রক্ত নিঃসরণের ফলে তাহার হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া তৎসঙ্গে আরও কয়েকটি রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায় চিকিৎসার এক পদ্ধতি এই হইতে পারে যে, প্রত্যেকটি রোগের চিকিৎসা পৃথক পৃথকভাবে করা হইবে। যেমন হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক সবলকারী ঔষধ সেবন করিয়া

www.BANGLAKITAB.com

উহাদের দুর্বলতা দূর করা হইবে। বলাবাহুল্য, এই উপায়ের চিকিৎসা বহু সময়সাপেক্ষ এবং আয়াসসাধ্য।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এই হইতে পারে যে, সমস্ত রোগের মূল অনুসন্ধান করিয়া উহার চিকিৎসা করা হইবে। যেমন, এস্থলে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয়ের কারণেই মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা এবং অন্যান্য রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এখন রক্ত বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত দেহে উৎপন্ন করিলেই যাবতীয় রোগ আপনাআপনি নিরাময় হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে এখানেও দুনিয়ার মহব্বতই যখন সমস্ত অনর্থের মূল, তখন দুনিয়ার মহব্বত অন্তর হইতে দূর করিতে পারিলে অন্যান্য দোষগুলি আপনাআপনিই সংশোধিত হইয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ব্যাপক চিকিৎসা।

দুনিয়ার মহব্বত মৌলিক রোগ কেন? এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, অন্যান্য দোষের সঙ্গে দুনিয়ার মহব্বতের এমন কি সম্পর্ক আছে, যদ্দরুন উহাকে সমস্ত রোগের মূল বলা হইয়া থাকে? যেমন, নামায না পড়ার সঙ্গে দুনিয়ার মহব্বতের কি সংস্রব? অথচ দেখা যাইতেছে যে, বহু সংসারাসক্ত লোক নামাযও পড়ে এবং রোযাও রাখে। এইরূপ সংসারাসক্তি লইয়াও বহু লোক বহু নেক কার্য করিয়া থাকে। তথাপি সংসারাসক্তিকে যাবতীয় মন্দ কার্যের মূল কেন বলা হইল? বাহ্যত কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বুঝা যায় না। যেমন, কাহারও মধ্যে রোগ আছে; কিন্তু দুনিয়ার প্রতি মহব্বত নাই।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে, প্রত্যেক মন্দ ও দূষণীয় কার্যের মূলে হইল সংসারাসক্তি। কেননা, সংসারাসক্ত লোকের হৃদয়ে কস্মিনকালেও পরলোকের প্রতি কোন আগ্রহ বা উৎসাহ থাকে না এবং মন্দ কাজ হইতে আত্মরক্ষা করার প্রবৃত্তিও হয় না। পক্ষান্তরে যাঁহার হৃদয়ে পরলোকের চিন্তা ও ভয় বিরাজমান থাকে, তাহার দ্বারা কোন পাপ কার্যই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কেননা, পাপী লোকের মনে পাপের পরিণাম সম্বন্ধে কোন ভয় নাই বলিয়াই সে পাপ কার্য করিয়া থাকে। বস্তুত পরলোকের চিন্তা যেমন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত, তদ্রূপ দুনিয়ার মহব্বতেরও নানাবিধ স্তর আছে। উভয় জাতীয় স্তরসমূহের মধ্যে যেগুলি পরস্পর বিরোধী, উহারা কোন ক্ষেত্রে একত্রিত হইতে পারে না। কিন্তু পরস্পর বিরোধী না হইলে একত্রিত হওয়া সম্ভব। ইহাই হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটির তাৎপর্যঃ

لَايَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ○

"যেনাকারী মু'মিন অবস্থায় যেনা করে না এবং চোরও মুমিন অবস্থায় চুরি করে না।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর একটি হাদীসে বলিয়াছেনঃ

مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ -

"যে ব্যক্তি কালেমা তাইয়্যেবা পড়িয়াছে, (অর্থাৎ, উহার মর্ম অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়াছে) সে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে, যদিও সে যেনা বা চুরি করে।

ঈমানের স্তর বিভিন্নঃ বস্তুত ঈমানের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। প্রথমতঃ, পরলোকের প্রতি গুরুত্ব প্রদানপূর্বক শুধু আল্লাহ্‌র একত্বে ও রাসূলের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন। ইহা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। ইহাতে ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহা ঈমান বলিয়াই গণ্য হইবে না। ঈমান পরলোক চিন্তার এই সর্বনিম্ন

www.BANGLAKITAB.com

স্তরটি ব্যভিচার, চুরি ও অন্যান্য পাপ কার্যের সহিত একত্রিত হইতে পারে। মূলত ঈমানের দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন, যেমন কোন চিকিৎসক নিজের রোগীকে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া তৎসম্বন্ধীয় সর্বপ্রকারের উপদেশ প্রদান করিলেন। চিকিৎসকের উদ্দেশ্য—ইহাতেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবে। কিন্তু হতভাগ্য রোগী ব্যবস্থাপত্রের সমস্ত ঔষধ সেবন না করিয়া উহার কিছু অংশ সেবন করিল। বলাবাহুল্য, ইহাতে সে সামান্য ফলই লাভ করিবে। অবশ্য পূর্ণ ব্যবস্থা-পত্র মানিয়া চলিলে পূর্ণ ফলই লাভ করিত। অনুরূপভাবে শুধু ঈমান কেবল অনন্তকালের আযাব হইতেই রক্ষা করিতে পারে। পূর্ণ পরিত্রাণলাভের কারণ হইতে পারে না। এই স্তরের ঈমানের সহিতই পাপ কার্যের সমাবেশ হইতে পারে। ঈমানের দ্বিতীয় স্তর—পক্ষান্তরে যেই দৃঢ় বিশ্বাস মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে স্বীয় প্রভাব পূর্ণরূপে বিস্তার করিতে পারে—তাহা ঈমানের উচ্চতম স্তর, ইহাই ঈমানে কামেল নামে অভিহিত। এই স্তরের ঈমান পাপ কার্যের সহিত একত্রিত হইতে পারে না। এই শ্রেণীর ঈমানদার লোক কর্তৃক কখনও ব্যভিচার, চুরি প্রভৃতি কোন জঘন্য স্তরের পাপ কার্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

ফলকথা, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। একটি উচ্চতম পর্যায়ের দৃঢ় বিশ্বাস। ইহার প্রভাবে ঈমানদার ব্যক্তি সর্ববিধ গোনাহ্‌র কাজ হইতে বিরত থাকে। ইহার নাম 'তাছদীকে কামেল' বা পূর্ণ বিশ্বাস। আর একটি তাছদীকে নাকেছ বা নিম্নতম পর্যায়ের বিশ্বাস। ইহা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মানুষ কতক গোনাহ্‌র কাজ হইতে মুক্ত থাকে এবং কতক পাপ কার্য তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই দ্বিতীয় স্তরের বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত চিকিৎসক প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের আংশিক অনুসরণের সমতুল্য। অর্থাৎ, আংশিক অনুসরণে আংশিক ফলই লাভ হয়। এইরূপে এই স্তরের বিশ্বাস দ্বারা এই ফল হইবে যে, মানুষ দোযখের অনন্ত শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে। কিন্তু পূর্ণ পরিত্রাণ অর্থাৎ, প্রথমবারেই নাজাত পাইবে না। পক্ষান্তরে প্রথম পর্যায়ের ঈমানের দৃষ্টান্ত চিকিৎসক প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের পূর্ণ অনুসরণের সমতুল্য মনে করুন। ইহার পূর্ণ অনুসরণে রোগী যেমন পূর্ণ ফল লাভ করিবে, তেমনি দোযখের অনন্ত শাস্তি হইতে মুক্তিলাভ ছাড়াও নানাবিধ পুরস্কার এবং নেয়ামতেরও উপযোগী হইবে।

কিংবা উপরোক্ত উচ্চ ও নিম্নস্তরের ঈমানদারকে এরূপ দুই ব্যক্তির সহিত তুলনা করিতে, পারেন, যাহারা বিষের মারাত্মক ক্রিয়ায় বিশ্বাসী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহাদের একজন বিষ পান করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। অপরজন বিষ পান করিল না। বলাবাহুল্য, ইহারা উভয়েই বিষকে ধ্বংসাত্মক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিষপানে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার বিশ্বাস ছিল দুর্বল এবং অপূর্ণ। কেননা, পূর্ণ বিশ্বাসের কোন লক্ষণ তাহার মধ্যে পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির বিশ্বাস এ সম্বন্ধে পূর্ণ ছিল, উহার ফলেই সে বিষ পান করে নাই।

অথবা অপূর্ণ ঈমানকে সেই ব্যক্তির সহিতও তুলনা করিতে পারেন, যে ব্যক্তি তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি কোনই গুরুত্ব দিল না এবং নিজের কাজ-কর্ম দুরুস্ত করিল না, অমনিই নির্বিকার রহিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, সে ব্যক্তি ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর আগমন-সংবাদ পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে নাই, নিতান্ত মামুলি মনে করিয়াছে। কেননা, তাহার পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে উহার ফল এই হইত যে, সে নিজের কাজ-কর্ম দুরুস্ত করিয়া রাখিত।

এইরূপে যেই বিশ্বাসের ফল বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তাহাই পূর্ণ বিশ্বাস বা ঈমানে কামেল। কামেল ঈমানদারের ঈমানের প্রভাব প্রতি পদে পদে পরিলক্ষিত হয়। যাহার অবস্থা এরূপ হইয়া

www.BANGLAKITAB.com

দাঁড়ায়, সে কখনও নাফরমানী করিতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি অতীতকালের কৃত ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধনে তৎপর হইয়া পড়ে। ভবিষ্যতে পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকে। এই উচ্চতম ও নিম্নতম স্তরের মধ্যস্থলে আরও বহুবিধ স্তর রহিয়াছে।

সংসারাসক্তির স্তর বিভিন্নঃ সংসারাসক্তিও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। কাহারও মধ্যে কম, কাহারও মধ্যে বেশী। কাফেরের মধ্যে অবশ্যই বেশী এবং মুসলমানের মধ্যে কম; কিন্তু কিছুটা আছে নিশ্চয়ই। আর ইহাই যাবতীয় পাপানুষ্ঠানের গোড়া। কেননা, সংসারানুরাগের ফলেই পরলোকের চিন্তা হ্রাস পায়। সুতরাং সংসারাসক্তি যেই স্তরের হইবে, পরলোকের প্রতি নিশ্চিন্ততাও সেই পর্যায়েরই হইবে। সংসারাসক্তি পূর্ণমাত্রায় হইলে পরলোকের প্রতি নিশ্চিন্ততাও পূর্ণমাত্রায় হইবে; যেমন কাফেরের মধ্যে তাহা দেখা যায়। আর মুসলমানের মধ্যে যাহার ভিতরে সংসারাসক্তি যেই পরিমাণে বিদ্যমান আছে; তাহার মধ্যে পরলোকের প্রতি নিশ্চিন্ত মনোভাবও সেই পরিমাণেরই। এখন আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি যে বলিয়াছিলাম, সংসারাসক্তিই যাবতীয় পাপানুষ্ঠানের মূল। যথার্থ কাফেরের মধ্যে ইহা তো পূর্ণরূপেই বিদ্যমান। দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যেও তাহা পরিদৃষ্ট হয়।

যদি বলেন যে, إِنَّ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا এই আয়াতটি কাফেরের নিন্দাবাদের জন্য অবতারিত হইয়াছে, আমাদের সম্মুখে আলোচনা করার জন্য ইহা কেন অবলম্বন করা হইল? আমাদের সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক? তবে বলা হইবে, এরূপ সন্দেহ এবং প্রশ্ন অনেকের মনেই উদয় হইয়া থাকে। কেননা তাহারা মনে করে, যেসমস্ত আয়াত কাফেরদের সম্বন্ধে 'নাযিল' হইয়াছে, মুসলমানদের সঙ্গে উহাদের কোন সম্পর্ক নাই। এই ধারণার বশীভূত হইয়াই তাহারা নিজেদের পরিণাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবং নির্বিকার। আমি বলি, তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখুন, কাফেরদের প্রতি শাস্তির ভীতি প্রদর্শনরূপে যেসমস্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে—উহাদের ভিত্তি কি? কাফেরদের ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এ সমস্ত শাস্তির ধমক, না তাহাদের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে? বলাবাহুল্য, ইহা স্পষ্ট যে, কাফেরদের মধ্যে যেসমস্ত ঘৃণিত আচরণ পরিদৃষ্ট হয়, উহাকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদিগকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই। মানুষ হিসাবে সকলেই তাঁহার নিকট সমান।

বরং মানুষের কার্যকলাপই আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা এবং বিরাগের মূল। যাহার আমল ভাল তিনি তাহাকে ভালবাসেন, আর যাহার আমল মন্দ তাহার প্রতি তিনি বিরাগ। কথায় বলে, "কর্মই প্রিয়, চর্ম প্রিয় নহে।" ব্যক্তিগতভাবে কেহ ঘৃণিত হইলে তাহার আমল যতই ভাল হউক না কেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় না হওয়াই উচিত। অথচ হাদীস শরীফে উক্ত রহিয়াছেঃ "বান্দার গোনাহ্ সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হইলেও তওবা করিলে তাহা মাফ হইয়া যায়।" অতএব, বুঝিতে হইবে, কাফেরদের উদ্দেশ্যে যেসমস্ত শাস্তির ধমক প্রদান করা হইয়াছে, উহা তাহাদের আমলের পরিপ্রেক্ষিতেই বটে; ব্যক্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নহে। সুতরাং ঐ শ্রেণীর কার্যকলাপ যদি কোন মু'মিনের মধ্যে দেখা যায়, সেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঘৃণিত এবং উক্ত শাস্তির ধমকের বা ভীতি প্রদর্শনের পাত্র বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য মু'মিনের প্রতি ঘৃণা কাফের-

www.BANGLAKITAB.com

দের ন্যায় তত কঠোর হইবে না। কেননা, কাফেরদের আমল কুফরের সহিত মিলিত হইয়া জঘন্যরূপে ঘৃণিত হয়।

সারকথা এই যে, কার্যাবলীই মহব্বত এবং বিরাগের মূল কারণ, তবে মু'মিন এবং কাফেরের অনুষ্ঠিত পাপ কার্যের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া নাশক কোন ঔষধ সেবন করিল না, তাহার মৃত্যু অনিবার্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিষ পান করার সঙ্গে সঙ্গে বিষনাশক ঔষধ সেবন করে, বিষের ক্রিয়া তাহার মধ্যেও হয় বটে; কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া থাকে, একেবারে প্রাণসংহার করে না। মু'মিন এবং কাফের কর্তৃক অনুষ্ঠিত পাপ কার্যের তুলনাও তদ্রূপ। মু'মিন ব্যক্তি পাপ কার্যরূপ বিষ পান করিলেও সঙ্গে সঙ্গে ঈমান ঠিক রাখিয়া বিষনাশক ঔষধও সেবন করিয়াছেন। উক্ত ঈমান পাপের বিষক্রিয়া দুর্বল করিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে কাফেরের ঈমান নাই বলিয়া তাহার বিষনাশক ঔষধ সেবন করা হয় নাই। ফলে পাপের বিষক্রিয়া তাহার মধ্যে পূর্ণরূপে চলিয়াছে। তবে ইহা সত্য যে, উভয়েই বিষ পান করিয়াছে। সুতরাং বিষের অনিষ্টকারিতার কথা উভয়কে শুনান হইতেছে।

ইহার আরও একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুনঃ পৃথিবীতে দুই প্রকারের অপরাধী রহিয়াছে। এক প্রকারের লোক বাদ্‌শাহের বিদ্রোহী এবং অবাধ্য, তদুপরি তাহাদের অপরাধ প্রবলও বটে। আর এক প্রকারের লোক অপরাধ করে সত্য; কিন্তু বিদ্রোহী নহে। দ্বিতীয় প্রকারের লোক যেহেতু অনুগত, কাজেই অপরাধের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে সত্য; কিন্তু আনুগত্যের কারণে তাহা অপেক্ষাকৃত লঘু হইবে। অর্থাৎ, তাহার শাস্তি সীমাবদ্ধ থাকিবে। পক্ষান্তরে বিদ্রোহী অপরাধীর শাস্তি হইবে সীমাহীন। তাহার শাস্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক হইবে। অর্থাৎ, তাহাকে অনন্তকালের জন্য বন্দী করিয়া রাখা হইবে।

অনন্ত আযাবের রহস্যঃ ইহাই কাফেরদের অনন্তকাল দোযখের আযাব ভোগ করার রহস্য। কাফেরেরা অনন্তকালের জন্য দোযখবাসী হইবে। কিন্তু পাপী মু'মিন দোযখে অনন্তকাল থাকিবে না। কারণ, মু'মিন লোক অপরাধ করিলেও বিদ্রোহী নহে। পক্ষান্তরে কাফেরেরা অপরাধও করে, তদুপরি বিদ্রোহীও বটে।

কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়া থাকে যে, কাফেরদের অনন্ত শাস্তি অযৌক্তিক। আমি বলি, কাফের -দের ন্যায় অপরাধীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ শাস্তির বিধান করিয়াছেন, এরূপ অপরাধীর জন্য আপনারাও অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, পৃথিবীর শাসক -মণ্ডলীর হাতে অনন্তকাল স্থায়ী শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা তত নাই; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার হাতে তাহা আছে। আপনাদের হাতে অনন্তকাল স্থায়ী শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা থাকিলে এরূপ অপরাধীর জন্য আপনারাও সেই ব্যবস্থাই করিতেন। কিন্তু কি করিবেন, অপরাধী নির্ধারিত সময়ে মরিয়া যায়, আপনাদের তাহাতে কোনই হাত থাকে না। কাজেই আপনারা অনন্ত শাস্তি প্রদানে অক্ষম। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনাদের হাতে তদ্রূপ ক্ষমতা থাকিলে কি করিতেন? বলাবাহুল্য, আপনারাও অনন্ত শাস্তিরই ব্যবস্থা করিতেন। মানুষের ক্ষমতা অসীম নহে বলিয়া অসীম শাস্তি প্রদানে তাহারা অক্ষম, ক্ষমতার যতটুকু থাকে তাহা প্রয়োগে মানুষ একটুও ত্রুটি করে না। দেখুন, কোন কোন দেশের বৈশিষ্ট্য হইল, তথাকার লোক দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। অতএব, তদ্রূপ দেশে দেশদ্রোহী অপরাধীকে 'যাবজ্জীবন কয়েদের' শাস্তি প্রদান করা হইলে তাহা ভারতীয় দেশদ্রোহী অপরাধীর শাস্তি অপেক্ষা দীর্ঘতম হইবে। কিন্তু ইহাতে কেহ প্রতিবাদ করে না যে, (পাক) ভারতে

www.BANGLAKITAB.com

(পাক) ভারতে এই শ্রেণীর অপরাধী মাত্র ২০/৩০ বৎসরের জন্য জেলখানায় আবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশে ইহাদিগকে ৫০ বৎসর হইতে ১০০ বৎসর পর্যন্ত কারাগারে কেন আবদ্ধ রাখা হয়? এরূপ অপরাধীর শাস্তি উভয় দেশেই 'যাবজ্জীবন কয়েদ' বা আজীবন কারাবাস। কিন্তু ইহার কি প্রতিকার আছে যে, কোন দেশের কয়েদী কারাগারে শীঘ্রই মারা যায়, আর কোন দেশের কয়েদীর মৃত্যু দীর্ঘকাল পরে হয়? সুতরাং তাহাদের কারাভোগের মেয়াদ বিভিন্নরূপ হইয়া পড়ে।

অনুরূপভাবে পরলোকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তথাকার আয়ুষ্কাল অনন্ত। কেহ সেখানে মৃত্যুমুখে পতিতই হইবে না? এদিকে বিদ্রোহীর শাস্তি ইহলোকেও 'যাবজ্জীবন কয়েদ' এবং পরলোকেও তাহাই। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থা যুক্তি বহির্ভূত বলা যাইতে পারে না। তিনি কোন নূতন কাজ তো করেন নাই। তাহাই করিয়াছেন যাহা তোমরা করিয়া থাক। পক্ষান্তরে পাপী মু'মিনদের অন্তরে যেহেতু ঈমান রহিয়াছে, কাজেই উহার ফলে তাহাদের এক নির্দিষ্ট কালের জন্য শাস্তি হইবে। কেননা, তাহারা খোদাদ্রোহী নহে। পক্ষান্তরে কাফেরেরা খোদাদ্রোহী এবং বিদ্রোহের শাস্তি অনন্ত কারাবাস। কাজেই তাহাদিগকে অনন্তকাল দোযখে বাস করিতে হইবে।

ছাত্রসুলভ প্রশ্নের উত্তরঃ এস্থলে ছাত্রসুলভ একটি প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতটি কাফেরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে এবং যেসমস্ত কার্যের দরুন তাহাদিগকে শাস্তির ধমক প্রদান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কতক শাখা-বিধান জাতীয়ও বটে। ইহাতে বুঝা যায়, কাফেরেরা শরীঅতের শাখা-বিধানগুলির আওতাভুক্ত, অথচ ফেকাহ্-শাস্ত্র ও মূলনীতিবিশারদ মনীষীদের মতে কাফেরেরা শরীঅতের শাখা-বিধানগুলির আওতাভুক্ত নহে। এই কারণেই তাঁহারা বলিয়াছেন, যদি কাফের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নামায পড়ে, তাহা শুদ্ধ হইবে না। কারণ, সে শরীঅতের বিধানা -বদ্ধ নহে। অনুরূভাবে ইসলাম গ্রহণের পর পূর্ব নামাযের কাযাও তাহার উপর ওয়াজেব নহে।

ইহার উত্তর এই যে, ইহাতে কাফেরেরা শরীঅতের শাখা-বিধানের আওতাভুক্ত হওয়া অব-ধারিত হয় না। কেননা, কাফেরেরা যে শাস্তি ভোগ করিবে, মূলত তাহা শুধু কুফরের জন্য হইবে। পক্ষান্তরে পাপী মুসলমান যে শাস্তি ভোগ করিবে তাহা কেবলমাত্র শাখা-বিধান অমান্য করার জন্যই হইবে। ইহা অবশ্য সত্য যে, শাখা-বিধান অমান্য করার দরুন কাফেরদের শাস্তি অতিরিক্ত হইবে এবং আযাবও অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। এ কথা নহে যে, শুধু শাখা-বিধান অমান্য করার জন্য শাস্তি হইবে।

ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করিতে পারেন, সরকারবিরোধী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন যদি বিদ্রো-হের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনাও সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, আর একজন কেবল নিজেই বিদ্রোহী, কিন্তু দেশে দেশে কোন আন্দোলন করে না, বলাবাহুল্য, দেশদ্রোহিতার শাস্তি উভয়েই ভোগ করিবে। কিন্তু বিদ্রোহের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টিকারীকে যে শাস্তি প্রদান করা হইবে, তাহা অবশ্যই অপর বিদ্রোহী অপেক্ষা গুরুতর হইবে, যেহেতু সে শুধু বিদ্রোহই সৃষ্টি করে নাই, সৃষ্টি করিয়াছে উত্তেজনা। এমতাবস্থায় উভয়ের মূল শাস্তি বিদ্রোহের জন্যই বটে; কিন্তু বিদ্রোহের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি করার দরুন একজনের শাস্তি অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়াছে।

শাখা-বিধানসমূহ অমান্যকারী কাফেরকে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীর ন্যায় মনে করুন। যে আল্লাহ ও রাসূলের সত্যতায় অবিশ্বাস তো করেই, তদুপরি শাখা-বিধানসমূহও অমান্য করে। অতএব, মূল কুফরের জন্যই তাহাকে অনন্তকাল দোযখের আগুনে জ্বলিতে হইবে। কিন্তু শাখা-বিধানসমূহ অমান্য করার দরুন আযাবের মধ্যে কঠোরতা অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। আর যে

www.BANGLAKITAB.com

কাফের ঈমানের শর্তবিহীন শাখা-বিধানসমূহ পালন করে; যেমন, ন্যায়-নিষ্ঠা, নম্রতা এবং বদান্যতা প্রভৃতি। ইহার দৃষ্টান্ত সেই বিদ্রোহী ব্যক্তির ন্যায়, যে শুধু বিদ্রোহই করিয়াছে, কিন্তু বিশৃঙ্খলা বা উত্তেজনা সৃষ্টি করে নাই। তাহার শুধু কুফরীর জন্যই শাস্তি হইবে, শাখা-বিধান অমান্য করার জন্য শাস্তি বৃদ্ধি পাইবে না। আশা করি, এই বর্ণনা দ্বারা উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন!

আর পাপী মুসলমানের দৃষ্টান্ত সেই অপরাধীর ন্যায় মনে করুন, যে ব্যক্তি দেশদ্রোহী নহে। সে বিদ্রোহী নহে বলিয়া বিদ্রোহের শাস্তি আজীবন কারাবাস ভোগ করিবে না, কেবল শাখা-বিধান অমান্য করার শাস্তি ভোগ করিবে।

আলোচ্য আয়াত হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, কাফেররা শাখা-বিধানসমূহের আওতাভুক্ত না হইলেও উহা অমান্য করার দরুন তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। অবশ্য ইহা তাহাদের কুফরীর শাস্তি কঠোরতম করার উদ্দেশ্যেই হইবে। অতএব, ভাবিয়া দেখুন, শাখা-বিধানসমূহের আওতা-ভুক্ত মুসলমান যদি উহা অমান্য করে, তবে এই আয়াতের মর্মানুযায়ী সে শাস্তির ধমকের এবং ভীতি প্রদর্শনের অধিক উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কেননা, শাখা-বিধানের আওতা বহির্ভূত কাফেরও যখন উহা অমান্য করার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন উক্ত বিধানের আওতাভুক্ত মুসলমান তাহা অমান্য করিলে কেন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না?

সারকথা এই যে, কার্য যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সে-ই শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের উপযোগী হইবে। সুতরাং যে নাফরমানীমূলক কার্যাবলী কাফেরদের মধ্যে বিদ্যমান, তাহা যদি আমাদের মধ্যেও পাওয়া যায়, তবে আমরাও অবশ্যই শাস্তির ভীতির উপযোগী হইব। কুফরীর শাস্তির ভীতির উপযোগী না হইলেও পাপানুষ্ঠানের শাস্তির উপযোগী অবশ্যই হইব।

ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের যেসমস্ত দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার সবগুলি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান না থাকিলেও কতকাংশ অবশ্যই বিদ্যমান আছে। অবশ্য তাহাও কাফেরদের সমপরিমাণ নহে। দেখুন, আয়াতের প্রথমাংশে বর্ণিত إِنَّ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا দোষ "যাহারা আমার দর্শনলাভের আশা পোষণ করে না"—সমস্ত মুসলমানই এই দোষ হইতে মুক্ত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, মুসলমান এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, পরলোকে আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভ হইবে। কাজেই اَلْحَمْدُ لِلّٰه কোন মুসলমানের মধ্যেই এই দোষটি নাই। কিন্তু দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত দোষ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ, "তাহারা দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট"—মুসলমানদের মধ্যে অবশ্য বিদ্যমান আছে। যদিও কাফেরদের সমপরিমাণ নহে; কিন্তু আছে নিশ্চয়ই। যদি কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হয়—যাহারা দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার দর্শনলাভের আশাও রাখে না, আয়াতে বর্ণিত শাস্তির ভীতি কেবল তাহাদের উদ্দেশ্যেই প্রদান করা হইয়াছে। মুসলমান দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকিলেও এই শাস্তির ভীতির পাত্র হইবে না, তবে তদুত্তরে বলা হইবে, ভাষায় অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিতে পারে না। ভাষায় পারদর্শী প্রত্যেকটি লোক আয়াতটি শ্রবণ করিয়া ইহাই বুঝিবে যে, কুফরীর সহিত মিলিত হওয়া ছাড়াও পৃথক পৃথক অবস্থায় এই দোষগুলিরও নিন্দনীয়তা বর্ণনা করা আয়াতটির উদ্দেশ্য।

www.BANGLAKITAB.com

অতঃপর বলিয়াছেনঃ وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا "এবং উহা লইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে"—এই বাক্যটি পূর্বোক্ত رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বাক্যের তাফ্‌সীর-স্বরূপ। ইহা কোরআনের তাফ্‌সীর সংক্রান্ত একটি সুন্দর অনুগ্রহের প্রকাশ। কেননা, দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকা মানুষের স্বভাব, ইহাতে ইচ্ছা শক্তির কোনই স্থান নাই।

দুনিয়ার সহিত আন্তরিকতা নিন্দনীয়ঃ নিছক দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকা যদি পাপ কার্য বলিয়া গণ্য হইত, তবে একটি মানুষও এই পাপ হইতে রেহাই পাইতে পারিত না। কেননা, দুনিয়ার জীবনে কে সন্তুষ্ট নহে? এই জন্যই رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কথাটির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল। ইহার ব্যাখ্যা সঙ্গে সঙ্গে না করা হইলে প্রত্যেক মানুষই পরকাল সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িত। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার ইহাই বিশেষ অনুগ্রহ যে, সঙ্গে সঙ্গে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন— رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا "যাহারা দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং উহা লইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে।"

শেষোক্ত কথাটি যোগ করিয়া দেওয়ার ফলে বুঝা গেল যে, দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকা তখনই নিন্দনীয় হইবে, যখন উহার সহিত আন্তরিকতাও থাকে; অন্যথায় নিন্দনীয় নহে। কেননা, দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন, অপর একটি আয়াতে এই কথাটি পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছেঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ — الاية

"অর্থাৎ, আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের পরিবার, তোমা-দের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায়ের বস্তু, যাহার বাজার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করিতেছ এবং তোমাদের বাসগৃহ, যাহা তোমাদের নিকট পছন্দনীয়—যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল অপেক্ষা এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় ....." এস্থলে আয়াতে বর্ণিত বস্তুসমূহ আল্লাহ্ এবং রাসূল অপেক্ষা অধিক প্রিয় হওয়ার অব-স্থায়ই শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু যদি এই সমুদয়ের প্রতি কিছু মহব্বত হয় এবং তাহা আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত অপেক্ষা অধিক না হয়, তবে তাহা দণ্ডনীয় ও নিন্দনীয় নহে। কেননা, এই পদার্থগুলি পার্থিব জীবনের অপরিহার্য উপকরণ। কাজেই ইহাদের প্রতি মানুষের অনুরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ সমস্ত পদার্থকে পছন্দ করা এবং তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হওয়া অর্থাৎ, মোটামুটি সম্মত থাকা শাস্তি ভোগের কারণ নহে। অবশ্য দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হইয়া পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িলে তাহা শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের কারণ হইবে। আর আন্তরিকতার ক্ষেত্রেই চিকিৎসার প্রয়োজন, অন্যথায় নহে।

এখন জানিয়া লওয়া দরকার اطمينان 'আন্তরিকতা' কাহাকে বলে—যাহার প্রতি ভীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতমীনান শব্দের মূল অর্থ—বিরতি বা নিবৃত্তি। ইহা গতিশীলতার বিপরীত। অতএব, দুনিয়ার জীবনে ইতমীনান হওয়ার অর্থ উহাতে এমন শান্তি ও তৃপ্তি আসা, যাহার ফলে মনে-প্রাণে সম্মুখের দিকে ভবিষ্যতের জন্য কোন আলোড়নও হয় না, কোন আগ্রহও হয় না।

www.BANGLAKITAB.com

কল্পনাশক্তি যেন আর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় না। যেমন, কোন পদার্থ কেন্দ্রস্থলে আসিয়া স্থির হইয়া যায়। নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, সম্মুখের দিকে চলে না। এমন অবস্থার জন্যই শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। বস্তুত আজকাল আমাদের অধিকাংশের অবস্থাই এরূপ! যে যেই অবস্থায় আছে তাহাতেই স্থির হইয়া রহিয়াছে। সম্মুখের দিকে আর পা বাড়াইতেছে না। দুনিয়ার জীবনের জন্যই আমাদের সম্যক চিন্তা নিয়োজিত। দুনিয়ার চিন্তায় নিমজ্জিত লোকদের অবস্থা এই যে, দুনিয়ার আলোচনা ভিন্ন আর কোন কিছুর আলোচনাই তাহাদের সেখানে নাই। এমন কি, রেলগাড়ীতে সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করিলেও দুনিয়ার বিষয়েই আলাপ করিয়া থাকে। যেমন, "আপনাদের অঞ্চলে শস্যের কেমন অবস্থা? বৃষ্টি কেমন হইয়াছে? অমুক অমুক জিনিসের দর কি?" মোটকথা, প্রত্যেক মজলিসেই কেবল দুনিয়ার আলোচনা। অথচ রেল ভ্রমণের সময়টুকু নিতান্তই নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত থাকার সময়। কিন্তু দুনিয়াদারগণ এরূপ সময়েও কেবল দুনিয়ার চিন্তায়ই নিমগ্ন থাকে। তাহাদের কল্পনা বা চিন্তাশক্তি ইহার সম্মুখে অগ্রসর হইতেই চায় না। দুনিয়ার উপরই স্থির এবং নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। পরলোকের কল্পনা বা চিন্তা কখনও মনের কোণে স্থান পায় না। অতঃপর বলিতেছেন, وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ অর্থাৎ, "তাহারা আমার নিদর্শন এবং প্রমাণসমূহ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও উহাতে চিন্তা করিয়া আমার শক্তি ও মহিমা উপলব্ধি করার প্রতি মনোনিবেশ করে না।" এদিক হইতে সর্বদা সম্পূর্ণ অমনোযোগী থাকে। ইহাই হইল এই তিনটি বাক্যের সারমর্ম, যাহাতে মূল অপরাধ এই প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার জীবন লইয়া আমরা শান্ত এবং স্থির হইয়া রহিয়াছি। আমাদের কল্পনা বা মনোযোগ পরলোকের দিকে মোটেই অগ্রসর হইতেছে না।

পরলোকের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রকারভেদঃ এখন বুঝিয়া লউন, দুনিয়ার জীবনে স্থিরতা ও নিশ্চলতার বিপরীত পরলোকের দিকে অগ্রগতি তিন প্রকারঃ ১। বিশ্বাসের গতিশীলতা, ২। কর্ম-চাঞ্চল্য, ৩। অবস্থার সচলতা। অর্থাৎ, পরলোকের আকর্ষণে ও ধ্যানে সর্বদা অস্থির থাকা এবং উহারই অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকা। কাফেরদের মধ্যে উক্ত ত্রিবিধ অগ্রগতির কোনটিই নাই। কেননা, তাহাদের বিশ্বাসই সুস্থ এবং সঠিক নহে। দুনিয়াদার মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাসের গতিশীলতা অবশ্যই বিদ্যমান। কিন্তু কর্মের ও অবস্থার গতিশীলতা নাই। অর্থাৎ, পরলোকের কার্যের জন্য কোন ধ্যান বা চেষ্টাও নাই, কোন অনুসন্ধানও নাই। এই রোগটি প্রায় ব্যাপক। সাধারণ লোক তো দূরেরই কথা—আমাদের শিক্ষিত সমাজের অবস্থাই এইরূপ যে, আমাদের মন আখেরাতের চিন্তায় অস্থির নহে। কিন্তু কাহারও বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের হইলে তাহার মনে এক অস্থিরতার উদ্ভব হয়। কোন সময়ের তরে মনে শান্তি ও স্থিরতা থাকে না। সর্বদা কেবল সেই মোকদ্দমারই ধ্যান-চিন্তা আর উহার কল্পনা। দেখুন, দেশে যখন প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিয়াছিল, তখন সকলের মনে কেমন অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল! কোন সময়েই মনে শান্তি ছিল না। শুধু উহারই চিন্তা এবং উহারই ধ্যান। আখেরাতের জন্য আমাদের মনে কিন্তু তদ্রূপ অবস্থা নাই; বরং যে যেই অবস্থায় আছে উহাতেই স্থির রহিয়াছে। বর্তমান অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নততর অবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটুও চেষ্টা নাই। মনে করুন, যথানিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িতেছি। ইহাতেই স্থির রহিয়াছি, ইহাছাড়া কিছু অতিরিক্ত নফল নামায পড়ার চেষ্টা বা কল্পনা কখনও হয় না। কোন সময় এমন কল্পনাও করি না যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই আমরা ঠিকমত

www.BANGLAKITAB.com

আদায় করিতেছি কিনা। ইহাও এক প্রকারের গতিশীলতা, যাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছি। মোটকথা, আমরা যেই অবস্থায় আছি তাহাতেই স্থির রহিয়াছি। তাহা লইয়াই তৃপ্তি বোধ করিতেছি এবং মনে করিতেছি যে, সবকিছুই সমাধা করিতেছি। অথচ আমাদের অবস্থা এরূপ হওয়া উচিত ছিল যে, সবকিছু করা সত্ত্বেও ভীত এবং সন্ত্রস্ত থাকি। যেমন, আল্লাহ্ পাক খোদাভীরু লোকের বর্ণনায় বলিয়াছেনঃ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآاٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ "যাহারা যাহা দান করিবার ছিল দান করে এবং তাহাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে গমন করিবে।" অর্থাৎ, নেক কাজ করিয়াও তাহাদের অন্তর ভীত এবং সন্ত্রস্ত থাকে। দেখুন, কোন ঊর্ধ্বতন অফিসারের অধীনস্থ কর্মচারীগণ যদি খুব তৎপরতার সহিত কাজ করে, তথাপি অফিসারের আগমনের সময় তাহাদের মনে এই ভয় উদিত হয় যে, পাছে ঊর্ধ্বতন অফিসার আমাদের কাজ অনুমোদন না করেন। অতএব, অফিসারের আগমনকালে তাহাদের হৃদয়ে অস্থিরতা এবং চাঞ্চল্য বিরাজ করে যে, কি জানি, আমাদের পরিণাম কি হয়? মুসলমানদের অন্তরের অবস্থাও ঠিক এইরূপ হওয়া উচিত। কাজ সমাধা করার পরেও এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকা উচিত—হাশরে আমাদের অবস্থা না জানি কেমন হয়? মুসলমানের হৃদয়ে পরকাল সম্বন্ধে কখনও শান্তি, স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা থাকা উচিত নহে। এরূপ অবস্থা উৎপন্ন না হইলে মনে করিতে হইবে কিছুই হাসিল হয় নাই।

দেখুন, আম্বিয়ায়ে কেরাম যাবতীয় অবস্থা বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন। অথচ আমরা এমন নিশ্চিন্ত ও স্থিতিশীল অবস্থায় আনন্দে কাল যাপন করিতেছি, তথাপি আমরা নিজের পরহেযগারীর গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের চেয়ে অধিক পরহেযগার নিশ্চয়ই নহি। তাঁহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে চিন্তা করিতে করিতে ওষ্ঠাগত প্রাণ ছিলেন। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানেরই কোন সময় নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে; বরং তাহাদের অবস্থা এরূপ হওয়া উচিতঃ

عاشقی چیست بگو بندۂ جاناں بودن ـ دل بدست دگرے دادن و حیراں بودن

"প্রেম কি? বল, প্রিয়জনের আজ্ঞাবহ দাস হওয়া এবং স্বীয় ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে তাহারই ইচ্ছাধীন করিয়া অস্থির ও পেরেশান থাকার নাম প্রেম।"

এই চিন্তা ও চাঞ্চল্য কিসের জন্য? আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভে উন্নতি করার জন্য। আল্লাহ্‌র নৈকট্যের কোন সীমা নাই, কাজেই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ নৈকট্য লাভ করিয়া বিরত ও তৃপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। সেই দরবারের অবস্থা এইরূপ যে, যতই উন্নতি লাভ কর না কেন, তাহাই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কবি বলিয়াছেনঃ

اے برادر بے نہایت درگہے است ـ ہرچہ بروے میرسی بروے مایست

"ভ্রাতঃ! আল্লাহ্‌র দরবার একটি সীমাহীন দরবার। উহার যতই নিকটে পৌঁছিবে ততই সেই অতিক্রান্ত পথ চিহ্নবিহীন অনতিক্রান্ত বলিয়া বোধ হইবে।"

আমরা সংসারে বহু ভূস্বামীকে দেখিয়াছি, তাহারা দুনিয়াতে যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, কোন পর্যায়েই তৃপ্ত হয় না। যে পরিমাণ ভূমিরই মালিক হউক না কেন তাহাতে তৃপ্ত থাকে না; বরং আরও ভূমি আরও কতগুলি গ্রাম অধিকারে আনয়নের লিপ্সায় প্রতিনিয়ত অস্থির থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু আফ্‌সোসের বিষয়, আখেরাতের বেলায় মানুষ কেমন করিয়া শুধু নামাযের গুটিকতক সজ্‌দা করিয়াই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া যায়? চাকুরীজীবীদের মধ্যে আজ যাহার মাসিক বেতন ৫০·০০ টাকা, কাল সে কেমন করিয়া ১০০·০০ টাকা মাসিক বেতন লাভ করিবে সে চিন্তায় অস্থির থাকে। যাহাদের বাড়ী-ঘর প্রস্তুত করাইবার শখ আছে, তাহাদের সর্বদা চিন্তা থাকে—কেমন করিয়া ঘর-বাড়ীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা যাইবে। কোন এক শৌখীন ধনী ব্যক্তির দালান-কোঠা নির্মাণের শখ ছিল অপরিসীম। সর্বদা এই ধ্যানেই থাকিতেন, কেমন করিয়া আর একখানা বাড়ী বা দালান নির্মাণ করা যায়। তিনি বলিতেনঃ হাতুড়ির আওয়ায আমার কানে না আসা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসে না। দালান-কোঠা ও অট্টালিকা সম্বন্ধে রাজমিস্ত্রীদের উক্তি—"এক গজ ভূমিতে সারা জীবন রাজমিস্ত্রীর কাজ চালু রাখা যায়।" এক গজ ভূমিই সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট, একতলার উপর আর একতলা, এইরূপ সারা জীবনব্যাপী নির্মাণকার্য বাড়ান হইলে এক জীবনে তাহা সমাপ্ত হইবে না।

মোটকথা, যাহার যে বস্তুর দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা লাভ করিয়া সে কখনও তৃপ্ত হয় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আখেরাতের বেলায় মন তৃপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি কখনও তৃপ্তি আসে না। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

اے که صبرت نیست از دنیاے دوں ـ صبر چوں داری زنعم الماهدون
اے که صبرت نیست از فرزند وزن ـ صبر چوں داری زرب ذو المنن

"এই নশ্বর দুনিয়ার মহব্বতে তোমার আত্মার তৃপ্তি হয় না। কিন্তু জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা হইতে তোমার মন কিরূপে তৃপ্ত হইয়া গেল। স্ত্রী-পুত্রের ভালবাসা হইতে তোমার মন তৃপ্ত হইল না, তবে দয়াল আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত হইতে কেন তুমি তৃপ্ত হইয়া গেলে?"

দুনিয়ার ঝামেলায় কখনও তোমাদের মন বিরক্ত হয় না; কিন্তু আল্লাহ্ ও রাসূল হইতে বিরক্ত হইয়া একদম ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া গেলে? কোথায় আগ্রহ! কোথায় উৎসাহ!! চিন্তাই নাই যে, ভবিষ্যতে কি হইবে? তবে আমাদের আসল ত্রুটি হইল দুনিয়ার জীবনের প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। বন্ধুগণ! যাহার মধ্যে গতিশীলতা বিদ্যমান থাকে তাহার অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে, যেমন কবি বলিয়াছেনঃ

دل آرام در بر دل آرام جو ـ لب از تشنگی خشک و بر طرف جو

"প্রিয়জন বক্ষেই রহিয়াছে, তথাপি প্রিয়জনের অন্বেষণ চলিতেছে। নদীর তীরে উপবিষ্ট; কিন্তু তৃষ্ণার জ্বালায় ওষ্ঠাধর শুষ্ক।"

ইহলোকে কেহ কাহারও প্রতি অনুরক্ত হইলে মিলনের পরে অনুরাগের অবসান হয়। যেমন, কেহ কোন বীরাঙ্গনা রমণীর প্রতি আসক্ত হইলে মিলনের সঙ্গেই আসক্তি সমাপ্ত হইয়া ক্রমশ তাহার প্রতি বিরক্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। কেননা, তাহার সৌন্দর্যের পরিসীমা এ পর্যন্তই। তাহার সম্মুখের দিকে আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু খোদার মহব্বতে তো কখনও তৃপ্তি বা বিরক্তি আসা উচিত নহে। কেননা, তাঁহার সৌন্দর্যের কোন সীমাই নাই। তথাকার অবস্থা এইরূপঃ

www.BANGLAKITAB.com

نه حسنش غایتے دارد نه سعدی را سخن پایاں
بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچناں باقی

"তাঁহার সৌন্দর্যেরও কোন সীমা নাই, সা'দীর বাক-স্পৃহারও শেষ নাই। কিন্তু তৃষ্ণাতুর রোগী পিপাসায় মারা যায়, অথচ সমুদ্র নিজ অবস্থার উপরই স্থায়ী আছে।"

আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অপর এক কবি বলিয়াছেনঃ

قلم بسکن سیاهی ریز و کاغذ سوز و دم در کش
حسن ایں قصهٔ عشق است در دفتر نمے گنجد

"কলম ভাঙ্গিয়া ফেল, কালি ফেলিয়া দাও, কাগজ জ্বালাইয়া ফেল এবং বর্ণনা ক্ষান্ত কর। এশ্‌কে এলাহীর সৌন্দর্য কাহিনী অসীম। কাগজের দফতরে কলমের সাহায্যে কালি দ্বারা লিখিয়া শেষ করা যাইবে না।"

তাঁহার সৌন্দর্য কি শেষ হইবে? সৌন্দর্যের বর্ণনারও শেষ নাই। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝

"আপনি বলুন, যদি আমার প্রভুর মহিমা ও গুণাবলী লিখিবার জন্য সমস্ত সমুদ্রের পানি কালি-রূপে ব্যবহৃত হয়, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হইয়া যাইবে আমার প্রভুর সৌন্দর্য ও গুণাবলী সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই, যদিও অনুরূপ আরও সমুদ্রের পানি আনয়ন করা হয়। আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য ও মহিমা সম্বন্ধে অন্য এক কবি বলেনঃ

دامان نگه تنگ و گل حسن تو بسیار ـ گل چیں بهار تو زدامان گله دارد

"দর্শকের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টির অঞ্চল সঙ্কীর্ণ, আর তোমার মহিমা ও সৌন্দর্যের ফুল অনেক। সুতরাং তোমার সৌন্দর্যের পুষ্প আহরণকারী স্বীয় অঞ্চলের সঙ্কীর্ণতার অভিযোগ করিতেছে।"

তৃপ্তির দ্বিবিধ অবস্থা হইতে পারেঃ ১। সৌন্দর্য নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার কারণে। ২। দর্শকের আকাঙ্ক্ষার অভাবের কারণে। আল্লাহ্ পাকের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের তৃপ্তি সম্ভবই নহে। কেননা, তাহা অসীম, হাঁ, শেষোক্ত অবস্থা অর্থাৎ, আমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষার অভাবে তৃপ্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু মুসলমানের পক্ষে ইহা বড়ই অমনোযোগিতা এবং দোষের কথা। সুতরাং আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্য দর্শনের এবং মহিমা উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করা উচিত।

বন্ধুগণ! পরলোকের ধ্যান উৎপন্ন করুন এবং বুঝিয়া লউন, প্রত্যেক বস্তু লাভ করার নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। এইরূপে ধ্যান উৎপন্ন করারও প্রণালী রহিয়াছে। তাহা এইঃ মোরাকাবা করুন, আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের সংসর্গ অবলম্বন করুন। যেকের করুন। আমাদের উচিত দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র মহিমা সম্বন্ধে চিন্তা করা। দুঃখের বিষয়, আমরা কোন চিন্তাই করি না; চিন্তা করার অভ্যাস জন্মিলে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। আমাদের মধ্যে যাহাদের আমলের অভ্যাস আছে, তাঁহারা কেবল সময় ও সুযোগ করিয়া অধিক পরিমাণে ওযীফা পাঠ করিয়া থাকেন। নফল নামায পড়িয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, "ওযীফা ও নফল নামাযের জন্য যেরূপ সময় ও সুযোগ করিয়া লইয়াছেন, তদ্রূপ ধ্যান-চিন্তার জন্যও কিছু সময় রাখিয়াছেন কি? যাহাতে

www.BANGLAKITAB.com

পরলোকের বিষয় চিন্তা করিতে পারেন,—মৃত্যুর পরে কিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইবেন? কবরে কি অবস্থা ঘটিবে? হাশরের ময়দানের অবস্থা কিরূপ হইবে? পুল্‌সেরাতে কি অবস্থা ঘটিবে? আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন কি? বন্ধুগণ! আযাবের কথাও চিন্তা করুন, সওয়াবের কথাও চিন্তা করুন।

কোরআন শরীফে ধ্যান-চিন্তার বিভিন্ন পদ্ধতি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও বেহেশ্‌তের বর্ণনা এবং কোথাও দোযখের অবস্থা রহিয়াছে।

ধ্যানের জন্য বিপরীত বস্তুর উল্লেখের কারণ এই যে, মানুষের স্বভাব বিভিন্ন প্রকার। কাহারও দোযখের আযাব চিন্তা করিলে সুফল লাভ হয়। আবার কাহারও পক্ষে বেহেশ্‌তের বিবিধ নেয়ামত -সমূহের কল্পনা হিতকর হইয়া থাকে।

এক ব্যক্তি আমার নিকট অভিযোগ করিল যে, মৃত্যুর ধ্যান করিলে তাহার মন ঘাবড়াইয়া যায়। আমি বলিলাম ঃ মৃত্যুর ধ্যানে মন ঘাবড়াইয়া গেলে জীবনের চিন্তা কর। কল্পনা কর, এই জীবনের পরে ইহা অপেক্ষা উত্তম আর এক অনন্ত জীবন আছে।

বন্ধুগণ! দুনিয়া এবং আখেরাতকে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার সহিত তুলনা করুন। মনে করুন, এক ব্যক্তি একটি স্বর্ণ-মুদ্রা সঙ্গে লইয়া বাহির হইল, পথে আর এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট ঝক্‌ঝকে একটি রৌপ্য-মুদ্রা রহিয়াছে। সে ব্যক্তি স্বর্ণ-মুদ্রার মালিককে বলিল ঃ তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার ঐ মলিন মুদ্রাটি আমাকে দান করিয়া তৎপরিবর্তে এই উজ্জ্বল চক্‌চকে মুদ্রাটি গ্রহণ করিতে পার। স্বর্ণ-মুদ্রার বর্ণ উহার মালিকের দৃষ্টিতে রৌপ্য-মুদ্রার চাক্‌চিক্যের তুলনায় সুন্দর বোধ হইতেছিল না। অধিকন্তু রৌপ্য-মুদ্রাটি ওজনেও বেশী ছিল। এই কারণে সে বিনিময় করিতে সম্মত হইয়া গেল। এমন সময় এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, মিঞা! ধোঁকায় পতিত হইও না। রৌপ্য-মুদ্রাটি স্বর্ণ-মুদ্রার তুলনায় অধিক উজ্জ্বল এবং ভারি হইলেও একটি স্বর্ণ-মুদ্রার মূল্য ১৮টি রৌপ্য-মুদ্রার সমান। লোকটি তখন চিন্তা করিয়া দেখিল, ব্যাপার এরূপ হইলে আমি রৌপ্য-মুদ্রা লইয়া কি করিব? বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় লোকটি উক্ত মুদ্রা বিনিময়ে কখনও সম্মত হইবে না। ইহা হইল চিন্তার ফল।

চিন্তা করিলে প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ চিনিতে পারা যায়। মানুষ কোন বস্তু লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে পরিশেষে উক্ত বিষয়ের মূলতত্ত্ব জ্ঞানায়ত্ত হইয়াই যায়। সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাত সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া কিছুই নহে। স্বর্ণ-মুদ্রার তুলনায় রৌপ্য-মুদ্রার মূল্য যাহাকিছু আছে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্য তদ্রূপও নাই।

কোরআন শরীফে যে বর্ণিত আছে— لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ "যেন তোমরা দুনিয়া এবং আখেরাত সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ!" জনৈক তাফসীরকার দুনিয়া সম্বন্ধে চিন্তা করার কেমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন! অর্থাৎ, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট এবং সুখ-শান্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে, দুনিয়ার সুখ-শান্তি একদিন নিঃশেষ হইয়া যাইবে এবং দুনিয়ার জীবন কেবল দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে আখেরাত সম্বন্ধে চিন্তা করিলে উহার বিপরীত দেখিতে পাইবে। উভয়কে সমষ্টিগতভাবে লইয়া চিন্তা করিলে দুনিয়া তোমার দৃষ্টিতে নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয় বলিয়া মনে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। মোটকথা,

www.BANGLAKITAB.com

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া কিছুই নহে বলিয়া বুঝিতে পারিবে এবং এই ধ্যানের ফলে দুনিয়ার কষ্টও তোমার নিকট ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে। কেননা, তুমি যখন চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিবে যে, দুনিয়ার কষ্ট একদিন নিঃশেষ হইবেই। পক্ষান্তরে পরলোকে কেবল শান্তিই শান্তি। তখন দুনিয়ার কষ্ট কষ্ট বলিয়াই মনে হইবে না। এই কারণেই পূর্বোক্ত 'যা কর'কে বলিয়াছিলাম ঃ 'মৃত্যুর চিন্তায় মন ঘাবড়াইলে জীবনের চিন্তা কর।' আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগী চিন্তার বিষয় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের চিন্তা করিবার কোন অবসরই নাই।

চিন্তা এবং উহার বাধাসমূহ ঃ চিন্তা করার পথে কি কি বাধা আছে এখন আমি তাহা বর্ণনা করিব। দুইটি বস্তু চিন্তার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে। ১। দৈহিক কামনা। মানুষ দুনিয়ার নানা-বিধ কামনায় লিপ্ত হইয়া আখেরাতের চিন্তা করে না এবং ইহলোকের কামনাজালেই জড়িত হইয়া থাকে। ২। নফ্‌সের সুখ-শান্তি। কখনও বা মানুষ নফসের সুখ-শান্তির মোহে মত্ত হইয়া আখেরাতের চিন্তা হইতে বিরত থাকে। কেননা, তাহারা মনে করে, আখেরাতের চিন্তা মনে স্থান দিলে ইহলোকের সুখ-শান্তির ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু মানুষ ভাবিয়া দেখে না যে, আখেরাতের চিন্তার ফলে ইহলোকের দুঃখ-কষ্ট সহজ হইয়া যাইবে। অতঃপর সুখ-শান্তি সম্বন্ধেও মানুষের ভাবিয়া দেখা উচিত—আমি দুনিয়ার সুখ-শান্তির মোহে মাতিয়া থাকিলে আখেরাতের সুখ-শান্তি হইতে বঞ্চিত হইব। এরূপ চিন্তায় পদে পদে উপকৃত ও লাভবান হওয়া যায়।

মূল চিকিৎসা সংক্ষিপ্ত চিন্তা—ইহার সাহায্যে এল্‌ম এবং আমল সংশোধিত হইয়া যাইবে। এখন বুঝিয়া লউন, আমল দুই প্রকার। এক প্রকারের আমল জায়েয বা না-জায়েয হওয়া সম্বন্ধে আপনি অবগত আছেন, তাহা স্মরণ করিয়া এখন হইতে আমল করিতে আরম্ভ করুন। আর এক প্রকারের আমল জায়েয বা না-জায়েয হওয়া সম্বন্ধে আপনি অবগত নহেন, যথা—জমিদারী (সম্পত্তি) সংক্রান্ত অনেক কাজ এমনও আছে, যাহা জায়েয না-জায়েয হওয়া সম্বন্ধে লোকে কিছুই জানে না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করুন। আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হউন এবং তদনুযায়ী আমল করিতে থাকুন। এই বিষয় আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিলাম। চিন্তা করিলে ধর্মের সমস্ত দরজাই আপনাদের সম্মুখে মুক্ত দেখিতে পাইবেন।

চিন্তা করার দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন, যেমন ঘড়ির হেয়ার স্প্রিং। আকারে উহা খুবই ক্ষুদ্র। কিন্তু ঘড়ির অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় অংশগুলি ইহারই সাহায্যে নড়াচড়া করিয়া থাকে। এইরূপে চিন্তার সাহায্যে আপনারা ধর্মের দুর্ভেদ্য দুর্গও জয় করিতে পারিবেন। সাধারণ লোকের কথা কি বলিব, —আলেমগণই বা কি করেন? কিছুই করেন না। আমিও তদ্রূপই। অবশ্য আলেমদের চিন্তা করিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু নির্জনে বসার প্রতি গুরুত্ব নাই। মোটকথা, ব্যাপকভাবে আমাদের রুচি বিগড়াইয়া গিয়াছে। সর্বদা হট্টগোল এবং হাসি-ঠাট্টায় সময় কাটাইতেছি। আমাদের অবস্থা এই যে, ক্লাবে কিংবা বৈঠকখানায় বসিয়া হাসি-কৌতুকে সমস্ত সময়টুকু অতিবাহিত করিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ দুনিয়ার ঝামেলার জন্য আখেরাত সম্বন্ধে চিন্তা করার অবসরই পাইতেছি না। পাইলেও আখেরাতের চিন্তার পরিবর্তে এই চিন্তা আসিয়া মন অধিকার করে যে, অমুক বন্ধুর নিকট যাইয়া কিছু গল্প-গুজব করা যাউক; সময়ও অতিবাহিত হইবে, আমোদও উপভোগ করা যাইবে। অবশেষে সেখানে যাইয়াই অপকার্যে মূল্যবান সময়টুকু কাটাইয়া আসি।

গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, এইসব বন্ধু প্রকৃতপক্ষে আপনার শত্রু। মনে করুন, কেহ আপনার টাকা চুরি করিল। তাহার এই আচরণে আপনার মনে কেমন দুঃখ হইবে। তদ্রূপ আপনার

www.BANGLAKITAB.com

এই বন্ধু স্বর্ণ-মুদ্রা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করিয়াছে। অতএব, চিন্তা করিয়া দেখুন, সে কি সত্যই আপনার বন্ধু? আর এক ডাকাত 'হুক্কা'। এমন সর্বনাশা প্রথা প্রচলিত হইয়াছে যে, দুই পয়সার তামাক খরচ করিলে তদ্দ্বারা যত ইচ্ছা তত লোক একত্রিত করিয়া তাহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করা যাইতে পারে। মোটকথা, হুক্কা কি জিনিস? হুক্কা বিবিধকে সমবেতকারী। হুক্কার আয়োজন করিলে ভাল-মন্দ সর্বপ্রকারের লোকই একত্রিত করা যায়। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, কাহারও গৃহে মজলিস জমাইয়া শোভা বর্ধনের ইচ্ছা করিলে সে ব্যক্তি হুক্কার আয়োজন করিয়া থাকে। অতঃপর লোকের অভাব হয় না। ফলকথা, যেন নিজেরাই নিজেদের মূল্যবান সম্পদ (সময়) লুণ্ঠন করিয়া নেয়ার জন্য গল্প-গুজবের আসর জমাইয়া থাকে।

সময় বড়ই মূল্যবান ঃ বন্ধুগণ! সময় বড়ই মূল্যবান সম্পদ। ইহার মর্যাদা রাখুন, ইহার সদ্ব্যবহার করুন, ইহা এতই মূল্যবান যে, আযরাঈল আলাইহিস্‌সালাম রূহ্ কবয করার জন্য উপস্থিত হইলে, তখন আপনি সামান্য একটু সময়ের বিনিময়ে আপনার সম্পূর্ণ রাজত্বও দিতে প্রস্তুত হইয়া যাইবেন, কিন্তু তখন এক মুহূর্তের জন্যও সময় দেওয়া হইবে না। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

اِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَايَسْتَقْدِمُوْنَ ○ "মানুষের নির্দিষ্ট সময় (মৃত্যু) আসিয়া পৌঁছিলে তাহা হইতে এক মুহূর্তও এদিক-ওদিক হইবে না।"

এই পরস্পর মেলামেশার দ্বারা সময় নষ্ট করা সম্বন্ধে আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে। এই শ্রেণীর ভয়ঙ্কর লোকদের জ্ঞানশক্তিকে ভয় করি, পাছে বিপরীত না বুঝেন। আজকাল জ্ঞানশক্তির বড়ই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সোজা কথাকে উল্টা বুঝিয়া লয়। সুতরাং সেই জরুরী কথাটুকু বলিতে বাধ বাধ ঠেকিতেছে। কিন্তু যখন কথাটি মুখে আসিয়াই পড়িয়াছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াই ফেলিতেছি ঃ আজকাল কোন কোন মানুষ বিভিন্ন বুযুর্গ লোকের দরবারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ অমুক বুযুর্গের দরবারে, কাল আর এক বুযুর্গের দরবারে, পরশু অপর এক বুযুর্গের দরবারে। উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখুন, আজকাল ইহাতেও ধর্মের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। কেননা, অধিকাংশ বুযুর্গের দরবারে সর্বশ্রেণীর লোক একত্রিত হইয়া সর্বপ্রকারের আলোচনা করিয়া থাকে। এমন কি, গীবত বা অগোচরে দোষ ব্যক্ত করা পর্যন্ত। নবাগত লোকটি তাহাদের হাঁ'র-সঙ্গে হাঁ মিলাইয়া পাপের ভাগী হইয়া থাকে। আজকালকার অধিকাংশ মজলিসেরই এই অবস্থা। শেষফল এই যে, এই লোকটি বুযুর্গান হইতে যত লাভবান হয় তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বুযুর্গদের মজলিসেরই যখন এই অবস্থা, তখন অন্যান্য মজলিসসমূহের অবস্থা কেমন হইবে ভাবিয়া দেখুন। কিন্তু আজকাল স্থানে স্থানে মজলিস জমাইবার প্রথা ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈঠকখানাসমূহ নির্মাণের উদ্দেশ্য ইহাই। অতঃপর তথাকার অবস্থা এই হয় যে, কয়েকজন মানুষ একত্রিত হইতেই গীবত এবং অনর্থক বাজে গল্প-গুজব আরম্ভ হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে পরলোকের চিন্তার অভাবেই এ সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কোন কাজ না থাকিলে আর কি করিবে —বৈঠকখানায় বসিয়া নানাবিধ গোনাহ্‌র কাজে সময় নষ্ট করা হয়। আজকাল বৈঠকখানাগুলি এই উদ্দেশ্যেই নির্মিত হইয়া থাকে। যেসমস্ত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করা হারাম, বৈঠকখানায় বসিয়া তৎপ্রতিও দৃষ্টি করা হয়। এ সমস্ত বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকার অভ্যাসই লোপ পাইতে থাকে। এদিকে লক্ষ্যই থাকে না যে, অবৈধ দৃষ্টির জন্যও কঠিন শাস্তি হইবে। সুতরাং এ সমস্ত মজলিস হইতে পৃথক থাকাই অধিক নিরাপদ। ইহাতে অবৈধ কাজ হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ হইতে পারে।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত মাওলানা ইয়াকুব (রঃ) বলিতেনঃ আমাদের বুযুর্গীকে কলকারখানার কারিগরদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাহারা কারখানার গণ্ডির মধ্যে থাকা পর্যন্ত বিচক্ষণ শিল্পী; কিন্তু কারখানা এলাকার বাহিরে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেননা, কারখানায় তাহারা যাবতীয় কার্য মেশিন-এর সাহায্যে করিয়া থাকে। বাহিরে মেশিন অভাবে তাহারা কিছুই করিতে পারে না। আমাদেরও অনুরূপ অবস্থা। যতক্ষণ নির্জন কোণে অবস্থান করি, কিছু আমল এবং এবাদত করি এবং পাপ কার্য হইতে রক্ষিত থাকি। কিন্তু গৃহ হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ আরম্ভ হয়। আমি পরিপক্ক বা কামেল লোকের কথা বলিতেছি না। কামেল লোকেরা অবশ্য ইহা হইতে স্বতন্ত্র। কামেল লোক আছেনই বা কয়জন? তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আজকাল এইরূপ—যেন সহস্র সহস্র ছোলার মধ্যে একটি গমের বীজ।

আজকালকার মজলিসসমূহের অবস্থা ঃ আজকালকার সাধারণ লোকের মজলিসসমূহের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ইহারা পরলোকের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণেই তাহাদের মজলিসসমূহের এই দুরবস্থা। যাহার অন্তরে পরলোকের চিন্তা বিদ্যমান থাকিবে সে ব্যক্তি দুনিয়াদারদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ দেখিয়া বিরক্ত এবং পেরেশান হইবে। সে দেখিতে পাইবে, মানুষ ধর্মকে বিনষ্ট করিতেছে। দুনিয়ার মধ্যে এমনিভাবে মজিয়া গিয়াছে এবং উহা লাভ করিয়া এমনই নিশ্চিন্ত ও স্থিরচিত্ত হইয়াছে যে, ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধে একটুও চিন্তা করে না। সুতরাং যাহার হৃদয়ে ধর্মভাব বিদ্যমান, সে ব্যক্তি মানুষের ইত্যাকার অবস্থা দেখিয়া নির্জনতা অবলম্বন করিবে। আমি আপনাদিগকে কৃষিকার্য করিতে নিষেধ করিতেছি না। ক্রয়-বিক্রয় এবং দুনিয়ার অন্যান্য কাজকর্ম করিতেও বারণ করিতেছি না। আমার উদ্দেশ্য কখনও ইহা নহে যে, আপনারা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মসজিদের কোণে বসিয়া থাকুন; বরং আমার কথার উদ্দেশ্য এই যে, কাজকারবার সমস্তই চালু রাখুন; কিন্তু দুনিয়া হাসিল করিয়া পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবেন না। পরকালকে প্রত্যেক কাজের লক্ষ্যস্থল করিয়া লউন। প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করার পর যতটুকু সময় অবসর লাভ করেন তাহা বেহুদা কথাবার্তায় বিনষ্ট করিবেন না। শরীঅত বিগর্হিত কার্যসমূহে জড়িত হইবেন না; বরং যাহারা আজকালকার প্রচলিত মজলিসে অংশগ্রহণ না করিয়া হালের বলদের সাহচর্যে থাকে, তাহারা গল্প-গুজবে সময় নষ্টকারীদের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। খুব বেশী হইলে এতটুকু হইবে যে, ইহারা বলদের সংসর্গে থাকিয়া বলদ হইবে, কিন্তু পরলোকের শাস্তি হইতে অবশ্যই রক্ষা পাইবে।

আমি এই জন্য কৃষিকার্যকে পছন্দ করি যে, কৃষকদের পাপ কার্য করিবার সুযোগ কম ঘটে। কেহ পানি ছিটাইতে ব্যস্ত, কেহ নূতন শস্য কর্তন করিতেছে, কেহ সুর তুলিয়াছে। কোন কোন আল্লাহ্‌র বান্দা এমনও আছে যে, সুর তুলিয়া আল্লাহ্‌র যেকেরই করিতেছে। এ সম্বন্ধে শরীঅতের দৃষ্টিতে কিছু আপত্তি থাকিলেও আমার উদ্দেশ্য তাহাদের রুচি বর্ণনা করা। যাহাহউক, যেকের না করিলেও তাহারা আজেবাজে কথাবার্তা এবং গীবত-শেকায়ত প্রভৃতি হইতে অবশ্যই রক্ষিত আছে।

কৃষকদের কার্যধারা এই যে, ভোর হইতেই কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকে। দ্বিপ্রহরে বাড়ী হইতে খাবার আসিয়া পৌঁছিলে তাহা আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। অতঃপর পুনরায় কাজে লাগিয়া যায়। রাত্রে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং নামায পড়িয়াই শয়ন করে। কোন বাজে আলাপে বা গীবত-শেকায়তে যোগদান করা হইতে রক্ষা পায়। কৃষকদের মধ্যে অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা থাকে না। তাহাদের খুব অধিক দোষ থাকিলে এতটুকু হইতে পারে যে, নিজেদের

www.BANGLAKITAB.com

কাজে-কর্মে একটু শালীনতা বা বিচার-বুদ্ধি বিবর্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা শহুরেদের অশ্লীল আলোচনা, পরনিন্দা চর্চা প্রভৃতি জঘন্য পাপাচার অপেক্ষা হাজার গুণে ভাল। কিন্তু বিপদ এই যে, যাহারা এ সমস্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কার্য হইতে দূরে থাকে, তাহাদিগকে আজকাল পাগল বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু আসল ব্যাপার এইঃ

ما اگـر قلاش و گر دیـوانـه ایم ـ مست آن ساقی آن پیمـانـه ایم
اوست دیـوانـه که دیـوانه نه شد ـ مر عسش را دید و در خانه نه شد

"আমরা যদি মাতাল হই, কিংবা পাগল হই, তবে ঐ সাকী এবং ঐ পেয়ালার পাগল। বস্তুত যে ব্যক্তি পাগল হয় নাই সে-ই প্রকৃত পাগল।"....

নির্জনতা এবং উহার স্বরূপঃ নির্জনতা অর্থ মসজিদের নিভৃত কোণ নহে; বরং নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ব। উহা চাই গৃহেই হউক কিংবা জঙ্গলেই হউক। কেননা, যেকের- ফেকের বা তরীকতের শর্ত এই যে, নিজের অবস্থাকে বিশিষ্ট বা সম্মানিত পর্যায়ে রাখিও না। অথচ মসজিদের কোণ আজকাল বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে গণ্য হয়। নির্জনতা এমন হওয়া আবশ্যক যেন কেহ সন্ধানও না পায়। কেননা, সন্ধান পাইলে লোকে বিরক্ত করিয়া মারিবে। সুতরাং নির্জনবাসও কৌশলে করিবে। যেমন, কৃষিকার্যে লাগিয়া যান কিংবা অন্য কোন কাজে লাগিয়া থাকুন; কিন্তু সর্বপ্রকার মন্দ কার্য হইতে দূরে থাকুন। এই যুগে এই ধরনের নির্জনতাই উত্তম ব্যবস্থা।

মৌলবী যহীরউদ্দীন নামে একজন দরবেশ ছিলেন। তিনি আমার ফুফার ভাই। তিনি নির্জনবাসের এক চমৎকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। জনসমাবেশের মধ্যে থাকিতেন, গৃহের দ্বার মুক্ত রাখিতেন, নফল নামায পড়িতে থাকিতেন, কেহ আসিলে সালাম ফিরাইয়া তাঁহার সহিত সুন্দর ব্যবহার করিতেন। হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রয়োজনীয় কোন কথা থাকিলে তাহা শেষ করিয়া পুনরায় নামায আরম্ভ করিতেন। আবার সালাম ফিরাইয়া দুই এক কথা বলিয়া পুনরায় নামায আরম্ভ করিতেন। আমাদের মত কথা আরম্ভ করিলে কথার চরকা চলিতে থাকে এমন অবস্থা ছিল না। সাক্ষাৎকারী লোকেরা তাঁহাকে নীরস মনে করিয়া নিজেরাই তাঁহার নিকট যাতায়াত কমাইয়া দিত। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও করিত না যে, "বড়ই গর্বকারী এবং অহংকারী, কথাই বলেন না।" কেননা, তিনি নামাযেই থাকিতেন এবং নামাযে কেহ কথা বলে না। মানুষ ইহাই মনে করিত যে, মৌলবী ছাহেব অধিকাংশ সময় নামাযে থাকেন বলিয়াই অধিক কথা বলেন না। তিনি কখনও নির্জনে বসিতেন না, যাহাতে লোকে তাঁহাকে বিশিষ্ট লোক বলিয়া মনে করিতে পারে। তাঁহার নির্জনতার এই প্রণালী আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। বাহিরে উহাকে নির্জনতা বলিয়া মনে হইত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্জন এবং নিঃসম্পর্ক ছিলেন।

কোন একজন বুযুর্গের অভ্যাস ছিল, রাত্রে কথা বলিতেন, দিনে বলিতেন না। কেননা, রাত্রে জনসমাবেশ কম হইত, কাজেই দূষণীয় কথাবার্তার সুযোগ হইত না। রাত্রেও তিনি এশার পূর্ব পর্যন্তই কথা বলিতেন। এশার নামায পড়িয়াই গৃহে যাইয়া শয়ন করিতেন। এই স্বল্পালাপের কারণে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইত না। আর এশার পরে এমনিই তো বিনা প্রয়োজনে কথাবার্তা বলা সুন্নতবিরোধী; কিন্তু আজকাল লোকে বুযুর্গগণকে এশার পরেও বিরক্ত করিয়া থাকে। তাঁহাদের দরবারে যাইয়া ভিড় করে। তাঁহারা ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের খুবই কষ্ট হয়। তথাপি মানুষ তাঁহাদিগকে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করে। তাঁহাদিগকে বাধ্য

www.BANGLAKITAB.com

করিবার বা কষ্ট দিবার আপনাদের কি অধিকার আছে? তাঁহারা কত লোকের মন যোগাইবেন? আমার মতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে বারণ করিয়া দেওয়া উচিত। কেহ তাহাতে নারায হইলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই।

মানুষের নহে, কেবল সৃষ্টিকর্তার সন্তোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেঃ শুধু এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যেন খোদা ও রাসূল অসন্তুষ্ট না হন। সারাজগত বিগড়াইয়া যাউক, কোন পরোয়া নাই। মানুষকে কেহ সন্তুষ্ট করিতে পারেও না। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখাই সমধিক কর্তব্য। وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ "আল্লাহ্ এবং রাসূলের সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য রাখা অধিক কর্তব্য।" তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই তিনি মানুষের ঘাড়ে ধরিয়া তাহাদিগকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট করিয়া দিবেন। কিন্তু সাবধান! আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার মধ্যে এরূপ নিয়ত কখনও পোষণ করিবেন না যে, তাঁহাকে রাযী করিতে পারিলে মানুষেরও সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিব। মনে করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু মানুষ রাযী হইল না—তাহাতেই বা আপনার ক্ষতি কি? আল্লাহ্‌র সন্তোষকেই অগ্রগণ্য মনে করা কর্তব্য। মানুষ সন্তুষ্ট হউক বা না হউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। স্মরণ রাখিবেন, সন্তুষ্ট রাখার জন্য সকলের খোশামোদ-তোষামোদ করিলে নিজের ধর্ম বিনাশ করিয়া ফেলিবেন।

আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, মানুষের সহিত কঠোর ব্যবহার করুন; বরং যখনই মনে করিবেন যে, মানুষের সহিত মেলামেশা করিলে ধর্মভাবের ক্ষতি হইবে, তখন নম্রতার সহিত তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে, এই শ্রেণীর কথাবার্তা, আলাপ-ব্যবহারে ধর্মের ক্ষতি হয়। এই কারণে আমি দূরে সরিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। আপনার এই কথায় মানুষ অসন্তুষ্ট হইবে বটে, কিন্তু তাহাদের জন্য উপদেশ হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের সাহস কমিয়া যাইবে। পুনর্বার আপনার সম্মুখে কোন বাজে গল্প-গুজব উত্থাপনই করিতে সাহস পাইবে না। আজকাল বে-মরুওত না হইলেও কিছুটা কঠোর আচরণ ছাড়া কাজ চলে না। আমি আপনাদিগকে অভদ্রোচিত আচরণ করিতে বলিতেছি না। কিন্তু মানুষের সঙ্গে শালীনতা রক্ষা করিতে যাইয়া যদি আপনি খোদার নাফরমানী করিলেন, তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কি জবাব দিবেন? কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন?

বাজে বকিয়া সময় নষ্ট করাতে কি লাভ? সময়ের খুব সদ্ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য। উহার উত্তম উপায় এই যে, মেলামেশা কমাইয়া দিন। দোকানদারী প্রভৃতি সাংসারিক কাজকর্ম নির্জনতা বা নিঃসম্পর্কতার বিরোধী নহে। দোকানদারী শুধু এতটুকু কাজ—কেহ জিনিসের দর জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া দিন। যদি ক্রেতা বলে—'দিন,' বস্ সংক্ষেপে কাজ সমাধা হইয়া গেল। 'প্রয়োজন-ক্ষেত্রে শরীঅত কোন বাধা প্রদান করে নাই।'

অনুধাবন করুন, ফেরিওয়ালা তাহার জিনিস বিক্রয়ের জন্য যে ধ্বনি করিয়া বেড়ায়, "সোব্‌হা-নাল্লাহ্" বলিলে অন্তরে যতটুকু নূর উৎপন্ন হয়, সেই ধ্বনিতেও ততটুকু নূর উৎপন্ন হইবে। কেননা, ইহাও প্রয়োজনীয়।

মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজই এবাদতঃ সৎ উদ্দেশ্যে মুসলমান যত কাজই করিয়া থাকে, সব কিছুই শরীঅত অনুযায়ী এবাদত বলিয়া গণ্য হয়। বাহিরে তাহা দুনিয়াবী কাজ বলিয়া অনুমিত হইলেও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যে কথায় ধর্মভাবের ক্ষতি হয়, তাহা একটিমাত্র কথা হউক না কেন, উহা হইতে অবশ্যই নিবৃত্ত থাকিবেন।

www.BANGLAKITAB.com

আমি বলি, যদি দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক কম করার বরকত দেখিতে চান, তবে অন্তত দশ দিনের জন্য নিজের গৃহকর্মের ব্যবস্থা করিয়া নির্জনতা এবং নিঃসম্পর্কতা অবলম্বন করুন। দেখুন, ফল কি হয়। ইহাতে আপনি 'জুনাইদ বাগদাদী' হইতে পারিবেন না সত্য; কিন্তু আল্লাহ্ চাহে তো আপনার মধ্যে অনুভূতি উৎপন্ন হইবে। প্রথমে মন একটু বিচলিত হইবে বৈকি; কিন্তু পরিশেষে সবকিছুই সহজ হইয়া আসিবে। অতঃপর নিঃসম্পর্ক কাল যাপনের ফলে আপনি অনুভব করিতে পারিবেন যে, "অযথা মেলামেশা করিয়া যেই বৃথা গল্প-গুজবে সময় নষ্ট করিয়াছি, তাহা আমার হৃদয়কে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে।" ইতঃপর মরযীর খেলাফ সামান্য কিছু ঘটিতে দেখিলেই আপনার মনের অবস্থা এইরূপ হইবে

بر دل سالك هزاراں غم بود ـ گر زباغ دل خلائے کم بود

"হৃদয়োদ্যানের একটি অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে তরীকতপন্থীর অন্তরে সহস্র চিন্তা আসিয়া পড়ে।" অনুভূতি বিশুদ্ধ হওয়ার পর ইহার অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবেন। এখন তো আমাদের অনুভূতিই শুদ্ধ নহে। অনুভূতি শুদ্ধ হওয়ার ফলে অবস্থা এই পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিবে যে, এক মিনিটের জন্যও হাল্‌কার বাহিরে আসিলে যদি একটিমাত্র অনর্থক বাজে কথাও অনিচ্ছা-ক্রমে মুখ হইতে নির্গত হয়, তবে নিজের শ্রমার্জিত সমস্ত কর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যক্ষ গোনাহ্‌র কাজ হইয়া গেলে তো আর কথাই নাই।

বর্তমানে আমাদের অনুভূতির অবস্থা এই যে, সর্পদষ্ট ব্যক্তির মুখে যেমন নিমের পাতার স্বাদ মিষ্ট মনে হয়, তদ্রূপ আমাদের মুখেও হলাহলতুল্য পাপ কার্যসমূহ বড়ই সুস্বাদু মনে হয়। সুতরাং অতি সত্বর এই বিকৃত অনুভূতির চিকিৎসা করুন এবং এই উদ্দেশ্যে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুসন্ধান করুন। চিকিৎসকের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত এক বড় চিকিৎসা এই,যাহা আমি পূর্বে বলিয়াছি;—চিন্তা করিতে আরম্ভ করুন। পরলোকের যাবতীয় বিষয়ে চিন্তা করুন—"আমার মৃত্যু ঘটিলে কবরে যাইতে হইবে। প্রশ্নকারী ফেরেশ্‌তাদিগকে সঠিক উত্তর প্রদান করিতে পারিলে শান্তি পাইব, অন্যথায় শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। এইরূপে হাশরের ময়দানের যাবতীয় বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের কথাও চিন্তা করুন— আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে, অতঃপর পুলসেরাত অতিক্রম করিতে হইবে। ইহার পরে হয়তো বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিব, নচেৎ দোযখে নিক্ষিপ্ত হইব। দোযখে সহায়-সহানুভূতি কিছুই থাকিবে না। মোটকথা, পরলোকের আদ্যন্ত চিন্তা করিতে থাকুন।

আমলের উপযোগী একটি কথা ঃ ইহার সঙ্গে সঙ্গে কোন কামেল বুযুর্গের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করুন। সম্ভব হইলে তাঁহার সংসর্গে বসুন। সংসর্গের যাবতীয় হক্ আদায় করিতে পারিবেন না মনে হইলে দূরে থাকিয়া চিঠিপত্রের সাহায্যে তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী নিজের আমলের হেফাযত করুন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তত্ত্বাবধান রাখুন। রসনা কিরূপ কথাবার্তায় লিপ্ত আছে? কর্ণ কিরূপ কাজে মগ্ন রহিয়াছে? মোটকথা, শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলির কোন্‌টি কিরূপ কাজে লিপ্ত আছে উত্তমরূপে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং যথাকর্তব্য উহাদিগকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করুন। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে পীরকে সর্বদা অবহিত করিতে থাকুন এবং সংশোধনের জন্য তিনি যাহাকিছু নির্দেশ প্রদান করেন যথারীতি পালন করুন। কেননা, আভ্যন্তরীণ যাবতীয় রোগের ধরন-করণ সম্বন্ধে তিনি খুবই অভিজ্ঞ। কামেল পীর আত্মিক রোগসমূহের চিকিৎসক হিসাবে বিজ্ঞ এবং জ্ঞানী। এই রোগসমূহের

www.BANGLAKITAB.com

চিকিৎসা তিনি ভালরূপে জানেন। ফলকথা, আমাদের অভ্যন্তরস্থ ব্যাধি এই যে, আমরা পরলোক হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া দুনিয়াতেই তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট রহিয়াছি।

দুনিয়া লইয়া তৃপ্ত ও স্থির চিত্ত থাকা একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার, কিন্তু সর্ববিধ রোগের মূল। ইহার চিকিৎসা হইয়া গেলে অপর সমস্ত রোগেরই চিকিৎসা হইয়া যাইবে। আখেরাতের জন্য মন অস্থির না হইয়া দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট এবং স্থির চিত্ত থাকাই যখন সমস্ত রোগের মূল, তখন সর্বপ্রথম এই তৃপ্তি ও স্থির চিত্ততাকে অন্তর হইতে বাহির করিয়া ফেলুন এবং খোদার এবাদত নিজের জন্য কর্তব্য করিয়া লউন। প্রথমতঃ নিজের নফ্‌সের উপর এবিষয়ে বল প্রয়োগ করিতে হইবে বৈকি? আল্লাহ্‌র এবাদতের বিশেষ ফল এই যে, উহাতে অন্তরে চিন্তার উদ্ভব হইয়া থাকে। চিন্তা উৎপন্ন হইলে অন্য সমস্ত কাজ আপনাআপনি ঠিক হইয়া যাইবে। আরও একটি বিষয় নিজের জন্য অবশ্য করণীয় করিয়া লউন। মনে যাহা চায় তৎক্ষণাৎ তাহা করিবেন না; বরং প্রথমে আলেমদের নিকট হইতে উহার বিধান জানিয়া লউন। তাঁহারা 'না-জায়েয' বলিলে সে কাজ কখনও করিবেন না। নিজকে সর্বদা ওলামায়ে কেরামের মুখাপেক্ষী মনে করুন। আলেমদের সম্মান করুন। নিজের কার্যধারা এইরূপ করিয়া লইলে অন্তর পুনরায় কখনও দুনিয়ার প্রতি তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইবে না।

আর ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, নিজে আলোড়ন সৃষ্টি না করিলে কখনও আপনাআপনি জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। নিজে মনোযোগ প্রদান না করিয়া কেবল তাওয়াক্কুলের উপর বসিয়া থাকিলে কোন লাভ হইবে না। আপনি ইচ্ছাশক্তিতে আলোড়ন সৃষ্টি করিলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতেও অনুগ্রহ দৃষ্টি অর্পিত হইবে। যেমন, হযরত ইউসুফ (আঃ) জোলায়খার কুঠি হইতে পলায়নের ইচ্ছা করিতেই উহার কোঠাগুলির তালাসমূহ আপনাআপনি খুলিয়া গেল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ার জন্য স্বভাবত ইচ্ছা করা শর্ত। আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা 'আহাদী' অর্থাৎ, খোদাগত প্রাণ হইয়া পড়িয়াছি। কোন প্রকারের গতিশীলতাই আমাদের নাই। কোন প্রকার আলোড়নই নাই।

এখন আমি বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি। পুনরায় বলিতেছি, আপনাদের সারাজীবনের জন্য ব্যবস্থাপত্র হইল চিন্তা করা। ইহাতে কখনও গাফলতি করা চলিবে না। তাহাতেই অপর সমস্ত কাজের ত্রুটি সংশোধিত হইয়া যাইবে। আমি চিকিৎসার সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায় বলিয়া দিলাম। কেহ যদি তদনুযায়ী আমল না করেন, তবে উহার কি চিকিৎসা আছে? বর্তমানে ইহা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কোন বিষয়বস্তু স্মরণপটে উপস্থিত নাই। অবশ্য যাহাকিছু বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যতটুকু বলিয়াছি তদনুযায়ী আমল করিতে থাকিলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিজেরাই চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিবেন। যতটুকু বলিয়াছি তদনুযায়ী আমল আরম্ভ করিয়া দিন। এখন এই দো'আ করিতেছি—আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে আমলের তাওফীক্ দান করুন।

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

■

'উজ্‌ড়াহ্' জেলাঃ মীরাঠ
১৩২৬ হিজ্‌রী, ১৪ই রজব

www.BANGLAKITAB.com

মাতাউদ্‌দুনিয়া

[পার্থিব-উপকরণ বা উপভোগ্য বস্তু]

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ط فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

ভূমিকা

উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুর নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয়তা ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে ধর্মের এক বিশেষ কাজে গাফলতির জন্য তিরস্কার করিতেছেন। কিন্তু এখন সেই বিশেষ কাজের বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে; বরং এই তিরস্কারের ভিত্তি ও কারণ হিসাবে যে কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা اَرَضِيْتُمْ শব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই বর্ণনার উদ্দেশ্য। কারণটি ব্যাপক বলিয়া আলোচ্য বিষয়ও ব্যাপক হইবে। অর্থাৎ, ইহাতে ধর্মীয় প্রত্যেক কাজের ত্রুটিই বর্ণিত হইয়াছে। তোমরা যে ধর্ম-কর্মে গাফলতি করিতেছ, তোমরা কি দুনিয়ার জীবনেই সন্তুষ্ট এবং তৃপ্ত হইয়া গেলে? এই গাফলতি যে তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিল, তবে কি তোমরা পরলোক সম্বন্ধে চিন্তা কর না এবং উহার প্রয়োজন বোধ কর না? অতঃপর বলিতেছেন, "পরলোকের তুলনায় দুনিয়াবী জীবনের উপকরণ বা উপভোগ্য বস্তুসমূহ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; বরং কিছুই নহে, এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা পরলোকের খেয়াল ত্যাগ করিয়া দুনিয়া লইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছ?" অর্থাৎ, উহার প্রতি এত গভীর অনুরাগ পোষণ করিতেছ যে, একেবারে উহাকে নিজের স্থায়ী নিবাসরূপে গ্রহণ করিয়াছ এবং এই কারণেই এই ধর্মীয় কাজে ঘাবড়াইয়া যাও। পক্ষান্তরে দুনিয়া এমন লোভনীয় কিছু নহে যে, মানুষ তথাকার জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। ইহাই তিরস্কারের কারণের বিষয়বস্তু এবং ইহা বর্ণনা করাই অদ্যকার ওয়াযের উদ্দেশ্য। আয়াতের তরজমা হইতে আপনারা ইহার সারমর্ম

www.BANGLAKITAB.com

উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। খোদা তা'আলা এস্থলে ঐসমস্ত লোককেই তিরস্কার করিতেছেন, যাহারা দুনিয়া লইয়া তৃপ্ত এবং স্থিরচিত্ত হইয়া রহিয়াছে এবং আখেরাতকে ভুলিয়া দুনিয়াকে প্রিয় মনে করিতেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ে এমন কেহ নাই, যাহার বিশ্বাস ঃ "আখেরাত কিছুই নহে।"

মুসলমানের আচরণ অবিশ্বাসীর ন্যায় ঃ কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহার দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন পরলোকে বিশ্বাসী নহে। কেননা, তাহাদের মধ্যে সংসারানুরাগ যতটুকু দেখা যায়, আখেরাতের প্রতি ততটুকু অনুরাগ এবং আগ্রহ দৃষ্ট হয় না। আমাদের হৃদয়-কন্দরে অনুসন্ধান চালাইলে দেখা যাইবে, ইহলোকের জীবনের জন্য আমরা কত রং-বেরং-এর কল্পনা রচনা করিতেছি আমরা এইরূপে অবস্থান করিব, এইরূপে বসতি করিব, অমুক জায়গায় বিবাহ করিব, অমুক সম্পত্তি খরিদ করিব, এই উপায়ে চাকুরীতে ডিপুটি কালেক্টর হইব ইত্যাদি। এখন ন্যায় দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখুন, কোন সময় পরলোক সম্বন্ধেও এরূপ আশা এবং কল্পনা করা হইয়াছে কিনা —আমাদিগকে অবশ্যই একদিন মরিতে হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে হিসাব-নিকাশের জন্য দাঁড়াইতে হইবে। পরলোকে সুরম্য বেহেশ্‌ত আছে, মনোরম বাগান এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা আছে, তাহাতে অপূর্ব সুন্দরী হূরগণ রহিয়াছেন ইত্যাদি। খুব সম্ভব, এরূপ আশা হৃদয়ে কখনও উদিত হয় না; বরং ইহার কল্পনা মনে খুব কমই উদিত হয়। ফলকথা, দুনিয়ার প্রতি যত অনুরাগ এবং আসক্তি হৃদয়ে বিদ্যমান, পরলোকের প্রতি তত অনুরাগও নাই, তত আগ্রহও নাই। কেননা, যদি থাকিত, তবে যেরূপ ইহলোকে অবস্থান সম্বন্ধে যত রকমের আশা ও কল্পনা মনে উদিত হয়, পরলোকের জন্য তদ্রূপ আশা এবং কল্পনা মনে উৎপন্ন হইত।

আর পার্থিব কাজকর্মের জন্য যত চিন্তা-ভাবনা করিয়া থাকে এবং ইহলোকের আমোদ-আহ্লাদে যেরূপ নিমজ্জিত হইয়া থাকে, পারলৌকিক বিষয়ের জন্যও কিছু না কিছু অবশ্যই হইত। আমাদের মধ্যে কতক লোক তো এমন আছে যে, দুনিয়ার আমোদে মত্ত থাকে, অথচ স্বপ্নেও আখেরাতের কথা কল্পনা করে না। আর কতক লোক এমন আছে যে, তাহাদের নিকট দুনিয়ার আমোদ- আহ্লাদের কোন উপকরণ নাই এবং এই কারণে তাহারা সর্বদা চিন্তিত ও বিষণ্ণ থাকে, আমোদ-আহ্লাদ তাহাদের ভাগ্যে কখনও হয় না। আমার কথার উত্তরে তাহারা হয়তো বলিবেন, "আমরা তো কখনও দুনিয়ার আমোদ উপভোগ করিতে পারি না। আমরা তো কেবল ইহাই চিন্তা করিয়া থাকি, আমাদের কোন ওলী-ওয়ারিস নাই। আমাদের জীবনযাত্রা কেমন করিয়া নির্বাহ হইবে। আমি তাহাদের কথার প্রতি-উত্তরে বলিব, তোমরা তোমাদের ইহজীবনের নিঃসহায়তা এবং নিঃসঙ্গতার বিষয় যেমন করিয়া চিন্তা করিয়া থাক, আখেরাতের বিষয়ও কোনদিন তেমন করিয়া চিন্তা করিয়াছ কিনা এবং তথাকার ভীষণ বিপদের কথা কল্পনা করিয়াছ কিনা যে, তথাকার জীবন কেমন করিয়া অতিবাহিত হইবে? দোযখে যাইতে হইবে, তখন উহার যন্ত্রণাময় শাস্তি কিরূপে বরদাশ্‌ত করা যাইবে? ইহলোকের কোন বিপদ বা দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করিয়া যেমন উহা লাঘব করার উপায়ও চিন্তা করিয়া থাক যে, সম্ভবত অমুক উপায় অবলম্বন করিলে এই বিপদ কাটিয়া যাইবে। কিংবা অমুক তদবীর করিলে এই বিপদ সহজসাধ্য হইয়া যাইবে। এইরূপে কখনও আখেরাতের বিপদসমূহের কথাও চিন্তা করিয়াছ কি?

অথচ পার্থিব বিপদসমূহের মধ্যে কতক এমনও আছে, যাহা লাঘবের কোন উপায় নাই। অতএব, সে সম্বন্ধে চিন্তা করাও নিষ্ফল। তথাপি তোমরা তাহা লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া থাক।

www.BANGLAKITAB.com

পক্ষান্তরে আখেরাতের কোন বিপদই উপায়বিহীন নহে; বরং আখেরাতের প্রত্যেক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় রহিয়াছে। তথাপি উহার কথা স্মরণও কর না, চিন্তাও কর না।

আখেরাত সংশোধনে তদবীরের প্রয়োজনীয়তা ঃ যদিও কেহ কেহ এমন আছেন যে, আলোচনাস্বরূপ কখনও কখনও আখেরাতের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং তাহাতে মনে করেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা আছে; কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হইবে না।

দেখুন, কাহারও নিকট আটা, তাওয়া এবং খড়ি সবকিছুই আছে, অথচ রুটি প্রস্তুত করে না। কিন্তু এ সমস্ত সরঞ্জাম সম্বন্ধে খুব আলোচনা করে এবং চিন্তা করিতে থাকে। বলুন তো, তাহার এই আলোচনা এবং চিন্তার কি ফল হইবে? প্রকৃত উপায় এই যে, সাহস করিয়া উঠুক এবং রুটি প্রস্তুত করুক। যখন ক্ষুধা বোধ করিবে তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিবে। আখেরাতের চিন্তাও ঠিক এইরূপই বটে। মনে করিবে যে, আমাকে মরিতে হইবে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে, এমন এমন আযাব হইবে। এতটুকু চিন্তার পরেই আযাব হইতে রক্ষা ও পরিত্রাণ পাওয়ার তদবীর আরম্ভ করিয়া দিবে। কিন্তু শয়তান অনেক লোককে ধোঁকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাদের মনে জাগাইয়াছে যে, যখন সময় সময় তোমাদের মনে এরূপ কল্পনা উদয় হয়, তখন তোমাদের মনে ধর্ম ও পরকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা আছে।

বন্ধুগণ! তোমাদের নিকট তদবীরের উপকরণ না থাকিলে এতটুকু চিন্তাই যথেষ্ট ছিল। খোদা তোমাদিগকে ইচ্ছা-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সাহস দান করিয়াছেন, ভালমন্দ তারতম্য করার বিচার ক্ষমতা দিয়াছেন। অতএব, ইহার কারণ কি যে, দুনিয়ার ব্যাপারে কেবল চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত হও না; বরং তদবীরেরও প্রয়োজন হয়। আর আখেরাতের বেলায় কেবল মনে চিন্তা থাকাই যথেষ্ট মনে করা হয়। অতএব, বুঝা যায়, কেবল কথার ছড়াছড়ি, প্রকৃতপক্ষে মনে আখেরাতের চিন্তাই নাই।

আখেরাতের প্রতি সমধিক গুরুত্বদান আবশ্যক ঃ যাহাহউক, যদি কেহ ইহলোকে আমোদ-আহ্লাদ করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে, আখেরাতের আমোদ করে না কেন? আবার যদি কেহ দুনিয়ার চিন্তায় বিষণ্ণ থাকে, তবে আমি তাহাকে বলিব, "পরলোকের বিপদ ভাবিয়া চিন্তিত হও না কেন?" যদি দুনিয়ার আমোদ-আহ্লাদকারী কোন ব্যক্তি বলে, আখেরাতের জন্য আমোদ-আহ্লাদ কোথা হইতে করিব? ইহার আশাই বা আমাদের কোথায়? আমরা তো পাপী। পক্ষান্তরে দুনিয়ার আমোদ নগদ এবং সম্মুখে উপস্থিত। ইহা উপভোগ করিব না কেন? আমি বলিব, ইহা শয়তানের ধোঁকা। তাহাদের এই উক্তিটি দুইটি দাবী সম্বলিত এবং উভয় দাবীই ভুল। প্রথম দাবী—দুনিয়ার খুশী নগদ। দ্বিতীয় দাবী—আখেরাতে আনন্দ কোথায়? প্রথম দাবী ভুল হওয়ার কারণ এই যে, দেখুন, আপনারা বলিয়া থাকেন, আমার পুত্র-সন্তান হইবে। এইরূপে খুশী ও আমোদ উপভোগ করিব। এস্থলে যে কাল্পনিক সম্ভাবনার উপর আপনারা আমোদ বা খুশী উপভোগ করিয়া থাকেন—তাহাতে আপনাদের ক্ষমতা বা অধিকার কোথায়? সহস্র সহস্র মানুষ এমন রহিয়াছে, যাহারা ভাবে এক হয় আর। যদিও কদাচ কোন ক্ষেত্রে কাল্পনিক খুশী কার্যকরী হইয়াও যায়, তথাপি অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, আকাঙ্ক্ষার সংখ্যা সর্বদাই ইহার সফলতা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ, আকাঙ্ক্ষা হয় অনেক, পূর্ণ হয় কম। সুতরাং যাহার আকাঙ্ক্ষা যতই অধিক হইবে, সে সর্বদা চিন্তা ও দুঃখে তত অধিক নিমজ্জিত থাকিবে।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ অবশ্য সকল অবস্থাতেই খুশী থাকেন। কেননা, তাঁহারা দুনিয়ার কোন আকাঙ্ক্ষাই করেন না। সন্তান জন্মিলেও খুশী, না জন্মিলেও খুশী, সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। দুনিয়াদারদের খুশী কোথায়? আল্লাহ্‌র কসম, শান্তি যাহাকে বলে, যদি তাহাই হাসিল না হয়, তবে ইহার উপকরণ যতই বেশী হইবে, অশান্তি ও দুঃখের কারণ ততই অধিক হইবে।

মানুষ টাকা-পয়সাকে শান্তির উপকরণ মনে করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাহা ঠিক নহে। অন্যথায় সিন্দুকও ইহার স্বাদ উপভোগ করিত। কিন্তু ইহারা সিন্দুকের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। কেননা, সিন্দুকের তো দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণানুভূতি নাই। অথচ ইহারা যন্ত্রণার মধ্যে লিপ্তই রহিয়াছে। অতএব, বুঝা যায়—দুনিয়াদার অতি অল্প সুখ-শান্তিই উপভোগ করিয়া থাকে। ফলকথা, ইহলোকে কোথাও আনন্দ নাই। দ্বিতীয় দাবী—আখেরাতে খুশী কোথায়? ইহা এই কারণে ভুল যে, আল্লাহ্ পাকের নিকট হইতে উহার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর উহা সম্পূর্ণ তোমাদের আয়ত্তে রহিয়াছে।

যেমন দেখুন, দুনিয়ার আনন্দ কোন কোন সময় হাসিলও হয় না। এমনও হয় যে, সারাজীবন ব্যাপিয়া আকাঙ্ক্ষা করিলেন কিন্তু পূর্ণ হইল না। তখন আর আনন্দের সুযোগ কোথায়? অথচ পরলোকের কোন আনন্দই এমন নহে যে, উহা ইচ্ছাধীন নহে। ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহ যে, পরলোকের আকাঙ্ক্ষা যতই উচ্চ হউক না কেন, নুবুওয়তের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া নিয়ম পালন করিলে অবশ্যই পূর্ণ হইয়া যায়। যেমন, কোন নিকৃষ্ট স্তরের পাপী যদি হযরত জুনাইদ রাহেমাহুল্লাহ্‌র মত উচ্চস্তরের ছালেহীনের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, তবে সে অবশ্যই নিজের আমলকে উন্নত করিলেই সে পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে।

অতএব, দেখুন, পরলোকে কেবল আনন্দই আনন্দ। তাহা সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছাধীন, তবে ইহারই চিন্তা করুন ও অন্তরে ইহার জন্য আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করুন এবং ইহার উপায় অবলম্বন করুন। অর্থাৎ, গোনাহ্‌র কাজ ত্যাগ করুন, নামায পড়ুন, যে নামায এ পর্যন্ত পড়া হয় নাই উহার ক্বাযা আদায় করুন। যাকাত আদায় করুন। অতঃপর সমস্ত আনন্দ আপনারই জন্য। তখন আপনার পূর্ণ আমোদ ও আনন্দ করার অধিকার হইবে।

এইরূপে যদি কোন বিপন্ন ব্যক্তি মনে করে যে, ইহলোকের বিপদ উপস্থিত। কাজেই ইহার প্রতিকারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিতেছি। আর আখেরাতের বিপদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও দয়ালু আছেন; কাজেই চিন্তা কিসের? স্মরণ রাখুন, ইহাও শয়তানের ধোঁকা। ক্ষমাকারী ও দয়ালু আল্লাহ্ এরূপ প্রতিশ্রুতি কোথায় দিয়াছেন যে, তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিলেও আমি তোমাকে শাস্তি প্রদান ব্যতীত প্রথমবারেই বেহেশ্‌তে দাখিল করিব? ফলকথা, পরলোকের নেয়ামতের কথাও কেহ চিন্তা করে না, তথাকার বিপদ এবং শাস্তির কথাও না। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়—মানুষ দুনিয়াকে চিরস্থায়ী বাসগৃহ করিয়া লইয়াছে।

হে মুসলমান! তোমাদের প্রকৃত বসতবাড়ী পরলোকে। কিন্তু তোমরা দুনিয়াকে নিজের বাসস্থান করিয়া লইয়াছ এবং নিজের জন্য ও নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য কেবল দুনিয়া কামনা করিতেছ। আমার বংশগত আত্মীয় এক মহিলা একবার আমার জন্য দো'আ করিলেনঃ আল্লাহ্ ইহাকেও দুনিয়ার সাথী বা শরীক দান করুন। কত নিকৃষ্ট ধরনের দো'আ করিলেন! ইহার সারমর্ম এই হয় যে, এখন তো সে কেবল ধর্মই ধর্ম লইয়া ব্যস্ত। দুনিয়ার কোন আকর্ষণ নাই, আল্লাহ্ তা'আলা করুন, সে যেন দুনিয়ার মধ্যে জড়াইয়া পড়ে। ইহাতে বুঝা যায়—তাঁহার দৃষ্টিতে দুনিয়াই শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল। এই কারণে তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমার স্নেহভাজনও ইহাতে জড়িত

www.BANGLAKITAB.com

হউক। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ কি সর্বনাশের কথা! এতদ্‌সঙ্গে ইহাও বুঝিতে চেষ্টা করুন যে, দুনিয়াকে তাহারা স্থায়ী বাসস্থান বলিয়া মনে করে। যদি তাহা মনে না করিত, তবে দুনিয়ার জন্য কোন চিন্তাই হইত না।

দুনিয়া ও আখেরাতঃ দেখুন, সফরে গমন করিয়া যদি কোন মুসাফিরখানায় অবস্থান করিতে হয়, তবে তথাকার চৌকিতে কেমন ছারপোকা দেখা যায়। কোন সময় চৌকিগুলি ভাঙ্গাচুরাও থাকে। তখন মুসাফির মনে করে—একটি রাত্রিই তো এখানে যাপন করিতে হইবে। যেমন তেমন করিয়া কাটিবেই, এক রাত্রের কষ্টে কি আসে যায়? পরের দিনই তো ঘরে পৌঁছিয়া যাইতেছি। মোটকথা, মুসাফিরখানার কষ্টকে এই জন্য কষ্ট মনে করা হয় না যে, উহাকে স্থায়ী বাসস্থান মনে করা হয় না। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের অবস্থাও তদ্রূপ। আপনি যদি দুনিয়াকে স্থায়ী বাসস্থান মনে না করিতেন, তবে দুনিয়ার সঙ্গে মুসাফিরখানার ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন। সদাসর্বদা কেবল দুনিয়ার আলোচনাই করিতেন না। দুনিয়ার এত জেরও টানিতেন না; বরং প্রত্যেক বিষয়ে আপনার মুখে এই রব থাকিত—"আমাদের বাসস্থান পরলোক।" এখানে অল্প দিনের কষ্টে কি আসে যায়। পরলোকে নিজের আসল বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া আরাম করিব। অথচ আমরা কখনও এরূপ কল্পনাও করি না। বিশেষ করিয়া মেয়েরা যদি কোন চিন্তায় পতিত হয়, তবে তাহাদের অবস্থা এরূপ হয়, যেন আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তাহাদিগকে কোন নেয়ামত বা সুখ-শান্তি প্রদান করেন নাই। তখন এই দুঃখ-কষ্টের আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন কাজই থাকে না। মনে হয়, যেন ইহাই তাহাদের দ্বীন এবং দুনিয়া। পুরুষেরাও অল্প-বিস্তর এরূপ অবস্থায় লিপ্ত। কেননা, বিপদকালে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই আখেরাতের কথা স্মরণ থাকে না। যদি তাহা স্মরণ থাকিত, তবে দুনিয়ার কোন বিপদই মুসাফিরখানার দুই দিনের কষ্ট অপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক বিচলিত করিতে পারিত না এবং বিপদ যতই সাংঘাতিক হউক না কেন, নিজের প্রকৃত বাসস্থান পরলোকের শান্তির কথা স্মরণ করিয়াই শান্ত হইয়া যাইত। যেমন, তাহার পরম স্নেহের কোন সন্তানের বিয়োগ ঘটিলেও সে অস্থির হইত না।

মনে করুন, কোন ব্যক্তি সপুত্রক সফর করিতেছিল। হঠাৎ পথিমধ্যে পুত্রটি নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। অনন্তর মুসাফির ব্যক্তি অনুসন্ধানে জানিত পারিল যে, তাহার ছেলে স্থায়ী বাসস্থানে চলিয়া গিয়াছে, আমিও তথায় যাইতেছি। এমতাবস্থায় সে কি পুত্রের জন্য কান্নাকাটি করিবে? কখনও করিবে না; বরং এই সংবাদ শুনামাত্র তাহার মন শান্ত হইবে এবং মনে করিবে, কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ী ফিরিয়া ছেলের সহিত মিলিত হইব। অতএব, আমরা যদি পরলোককে আমাদের আসল বাসস্থান মনে করিতাম, তবে সন্তানের বিয়োগে এত হা-হুতাশ করিতাম না। তবে হাঁ! বিচ্ছেদের জন্য কিছু শোক হয় বৈকি, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, মামুলি শোক করার অনুমতি আছে। কিন্তু যেমন বিচ্ছেদে দুঃখ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই ভাবিয়া সান্ত্বনাও গ্রহণ করা উচিত যে, সে তাহার শান্তি-নিকেতনে চলিয়া গিয়াছে। নিজের প্রকৃত বাসস্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, আমাদেরও তথায় যাইতে হইবে। সেখানে তাহার সহিত মিলিত হইব। এই বিষয়টিই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের আর একটি বাক্যে বলিয়া দিয়াছেনঃ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ইহার সারমর্ম এই যে, যে বস্তু চলিয়া গিয়াছে উহা খোদার সমীপেই গিয়াছে। আমরাও তাঁহার দরবারে যাইয়া পৌঁছিব এবং সকলে তথায় যাইয়া একত্রিত হইব। যদি আখেরাতকে নিজের ঘর মনে করিত,

www.BANGLAKITAB.com

তবে এরূপ ভাবিয়া সান্ত্বনা গ্রহণ করিত। সন্তান বিয়োগে কখনও ধৈর্যহারা হইয়া পড়িত না। কিন্তু আজকাল তো আপদে-বিপদে বা আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে এমন কান্নাকাটি ও বিলাপ আরম্ভ হইয়া যায়, যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বাস্তভিটা কাড়িয়া লইয়াছেন। ফলকথা, আপদে-বিপদে এবং শোকে-দুঃখে আমাদের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হওয়া উচিত, যেমন পার্থিব দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যখন তদ্রূপ হয় না, কাজেই বুঝিতে হইবে যে, সন্তান বিয়োগে এমন ধৈর্যহারা শোক দুনিয়াকে আমরা নিজের স্থায়ী বাসস্থান মনে করি বলিয়াই হইয়া থাকে।

দুনিয়াদার লোকের মৃত্যু-ভয়ঃ সুতরাং আমাদের প্রধান ভুল এই যে, আমরা দুনিয়াকে নিজের স্থায়ী বাসস্থানরূপে মনে করিয়া রাখিয়াছি। এই কারণেই ইহা ত্যাগ করিয়া যাইতে দুঃখ ও চিন্তা হয়। অন্যথায় মানুষ যখন সফরে থাকে, তখন যতই সে বাড়ীর নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই তাহার মন আনন্দে নাচিতে থাকে। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা এই যে, যতই মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসে, ততই প্রাণ মুসড়াইয়া পড়িতে থাকে। এই অবস্থা অবশ্য দুনিয়াদারদেরই হইয়া থাকে। কেননা, তাহারাই দুনিয়াকে নিজের বাসস্থান মনে করে। পক্ষান্তরে আল্লাহওয়ালাগণ মৃত্যুর জন্য একটুও চিন্তিত হন না, তাঁহারা নিজেদের মৃত্যুর জন্যও বিন্দুমাত্র পরোয়া করেন না, সন্তানের মৃত্যুর জন্যও তাঁহাদের কোন পরোয়া নাই। এমন কি, কোন কোন সময় মূর্খ লোকেরা তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুর বলিয়া সন্দেহ করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা নিষ্ঠুর নহেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের চেয়ে অধিক কোমলপ্রাণ কেহই নহে। সন্তানের মৃত্যুর বা নিজের মৃত্যুর জন্য তাঁহাদের অস্থির বা বিচলিত না হওয়ার কারণ শুধু এই যে, তাঁহারা আখেরাতকে নিজের প্রকৃত বাসস্থান মনে করিয়া থাকেন। এই কারণেই সন্তান বিয়োগে তাঁহারা ততটুকুই চিন্তিত হন—সপুত্রক সফরকারী পিতার পুত্র মুসাফিরখানা হইতে বাড়ী চলিয়া গেলে যতটুকু চিন্তিত হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, এরূপ পুত্রের সাময়িক বিচ্ছেদের জন্য পিতা সামান্য অস্থিরতা অনুভব করেন মাত্র, ইহা অপেক্ষা অধিক নহে। কেননা, তাঁহারা আখেরাতকেই নিজের প্রকৃত বাসস্থান মনে করেন। এই কারণেই তাঁহারা মৃত্যুর নিকটবর্তী হইলে আনন্দিত হন। যেমন, মুসাফিরের অভ্যাস—স্থায়ী বাসস্থানের নিকটবর্তী হইলে প্রফুল্ল ও আনন্দিত হইয়া থাকে। কোন কবি এ সময়ের আনন্দকে নিজের কবিতায় প্রকাশ করিতেছেনঃ

خرم آں روز کہ زیں منزل ویراں بروم ـ راحت جان طلبم وزپے جاناں بروم
نذر کردم کہ گر آید بسر ایں غم روزے ـ تا در میکدہ شاداں و غزل خواں بروم

"সেদিন কতই না আনন্দের হইবে যেদিন এই ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়ালয়ের পথে যাত্রা করিব এবং প্রিয়জনের অন্বেষণ করিব। আমি মানত করিয়াছি যে, যেদিন এই দূরত্বের চিন্তার অবসান হইবে সেদিন আমি আনন্দ করিতে করিতে এবং মিলন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শরাবখানার দ্বার পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিব।"

এক ব্যক্তি হযরত মাওলানা মুযাফ্ফার হুছাইন কান্ধলবীকে (রঃ) বলিল, হযরত! আপনি এখন বেশ বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় পাকা দাড়ির উপর হাত ফিরাইয়া বলিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, তিনি নিজের আমলের প্রতি কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মকবুল হওয়ার উপর গর্ববোধ করেন; সুতরাং শাস্তি না হওয়ার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল ও আনন্দিত থাকেন। اَسْتَغْفِرُ الله গর্ব করার ক্ষমতা কাহার

www.BANGLAKITAB.com

আছে? বরং উক্ত আনন্দ শুধু এই কারণে যে, তাঁহারা আখেরাতকে নিজেদের বাসস্থান মনে করিয়া থাকেন। প্রবাস হইতে বাসস্থানের দিকে যাইতে কাহার মনে আনন্দ না হয়? একটি কথা এই থাকিয়া যায় যে, তাঁহাদের মনে ধর-পাকড়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা হয় কিনা? ইহার উত্তরে বলিতেছি যে, আশঙ্কা অবশ্যই হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশাও হইয়া থাকে যে, সম্মুখীন হইলেও ইন্‌শাআল্লাহ্‌, আবার মুক্ত হইয়া যাইব।

মনে করুন, যেমন কাহারও বসতবাড়ী ভাঙ্গা-চুরা অবস্থায় পতিত রহিয়াছে এবং মুসাফিরখানা খুব পাকা ও মজবুত। এমতাবস্থায় মুসাফির নিজের ভাঙ্গা বাড়ীকেই মুসাফিরখানার পাকা বাড়ীর চেয়ে অধিক পছন্দ করিবে এবং সে মনে করিবে, যদিও এখন আমার ঘর ভাঙ্গা-চুরা, কিন্তু অচিরেই ইন্‌শাআল্লাহ্‌, আমি উহা পাকা করিয়া ফেলিব। এইরূপে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ যদিও শাস্তির আশঙ্কা করেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন, ঈমান নিরাপদ থাকিলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত হইবে। ফলকথা, স্থায়ী বাসস্থানের সহিত স্বাভাবিক মহব্বত হইয়া থাকে, যদিও সেখানে কিছু কষ্টও হয়। অতএব, তাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ করার কারণ নাই যে, তাঁহারা নিজেদের আমলের জন্য গর্বিত।

দুনিয়ার স্বরূপ সামনে রাখার ফল ঃ মোটকথা, উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সহস্র চিন্তার লাঘব হইবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় কামনাই লোপ পাইবে। আমরা যে দুনিয়াতে কামনা করিয়া থাকি ঃ এটাও হউক, ওটাও হউক। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন। যেমন, কেহ কেহ মুসাফিরখানায় আকাঙ্ক্ষা করে, এখানে বাতির ঝাড় লাগাইয়া দেওয়া হউক। অতঃপর নিজের অর্জিত পয়সায় তাহা লাগাইয়াও দিল। বলাবাহুল্য, ইহা মূর্খতা এবং বোকামি ছাড়া আর কিছুই নহে। বিশেষত যখন এরূপ নির্দেশও আছে যে, এই মুসাফিরখানায় কোন যাত্রী চারি দিনের অধিক কাল অবস্থান করিতে পারিবে না, এমতাবস্থায় নিজের অর্জিত পয়সায় এরূপ মুসাফিরখানার সাজসজ্জা করা পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতিরই পরিচায়ক হইবে। দুনিয়াও একটি নির্দিষ্টকাল অবস্থানের মুসাফিরখানা ছাড়া আর কিছুই নহে। উক্ত নির্দিষ্ট-কাল অতীত হইয়া গেলে বাধ্যতামূলকভাবে এখান হইতে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। প্রথমতঃ মুসাফিরখানায় অবস্থান ইচ্ছাধীন হইলেও সেখানে নিজ গৃহের ন্যায় আচার-ব্যবহার করা উচিত হইবে না। পরন্তু ইচ্ছাধীন না হইলে তো উহাতে মন লাগান আদৌ উচিত নহে; বরং উহার প্রতি অমনোযোগ এবং সঙ্কীর্ণ মনোভাবই পোষণ করা কর্তব্য।

দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার ঃ হাদীসে বর্ণিত এই নীতিবাক্যটির অর্থ বিভিন্ন টীকাকার বিভিন্নরূপ বলিয়াছেন। আমার মতে اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ 'দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার' বাক্যটির অর্থ ইহাই। দুঃখ-কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়াকে মু'মিনের জন্য কারাগার বলা হয় নাই। কেননা, কোন কোন মু'মিনকে দুনিয়াতে কোন প্রকার কষ্টই ভোগ করিতে হয় না; বরং ইহাকে মু'মিনের কারাগার এই হিসাবে বলা হইয়াছে যে, জেলখানায় যত শান্তি ও আরামের ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, তথায় কোন বন্দীরই মন বসে না। দুনিয়াতে মু'মিন লোকের অবস্থাও তদ্রূপ হওয়া উচিত। অর্থাৎ, যত প্রকার আমোদ-আহ্লাদ এবং সুখ-শান্তির ব্যবস্থাই দুনিয়াতে থাকুক না কেন— এখানে মু'মিন লোকের মন যেন কখনও না বসে। কেননা, মন আকৃষ্ট হইবার স্থান বাসগৃহ; অথচ ইহা নিজ বাসগৃহ নহে। সুতরাং এখানে থাকিয়া নানাবিধ বাসনা-কামনা কেন হইবে? কেন

www.BANGLAKITAB.com

লোকেরা এখানে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, এটা হউক ওটা হউক; বরং এই কল্পনা করিবেঃ দুনিয়া কারাগার, পরের দেশ, যে প্রকারেই এখানে কয়েকটা দিন কাটিয়া যায় আপত্তি নাই। দুনিয়ার চিন্তা ছাড়িয়া এখানে বসিয়া আখেরাতের চিন্তা করিবে যে, আখেরাতের জন্য এই সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, এই সম্বল আবশ্যক ইত্যাদি। আখেরাতের উপযোগী হওয়ার জন্য নিজের নফ্‌সের সংশোধন আবশ্যক। আবার এরূপ চিন্তাও করিবে যে, পূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে লইতে পারিলে আখেরাতে এরূপ আনন্দ হইবে, এরূপ শান্তি হইবে। অন্যথায় এই বিপদ হইবে, এই অশান্তি হইবে।

এখন গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখুন, এরূপ চিন্তা করে কয়জন লোকে? আমি বলি, দুনিয়া-দারের কথা ছাড়িয়াই দিন। দ্বীনদার লোকের মনেও আখেরাতের জন্য কামনা-বাসনা নাই। শাস্তির আশঙ্কাও করে না। আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার বলিয়াছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং প্রত্যেক লোকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত আগামীকল্যের জন্য পূর্বাহ্নে সে কি কি করিয়াছে? আবার বলি, আল্লাহ্‌কে ভয় কর।" দেখুন, একদিনের জন্যও যদি কোন স্থানে সফরে বাহির হন, তবে সঙ্গে প্রয়োজনীয় নাশ্‌তা এবং সাজ-সরঞ্জাম ও পাথেয়-সম্বল লইয়া থাকেন। আখেরাতের এই সীমাহীন সফরের জন্য কি পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন? বিশেষত উহা আপনাদের স্থায়ী বাসস্থান। এমতাবস্থায় তো তথাকার জন্য আরও অধিক পরিমাণে স্থায়ী সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, সফরের পথ অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে নাশ্‌তা ও পথের সম্বলের এবং ঘর-বাড়ীতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য উপার্জিত অর্থের ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল। আখেরাতকে নিজের স্থায়ী বাসস্থান মনে করার এক লক্ষণ ছিল ইহা। আর এক লক্ষণ ইহাও ছিল যে, দুনিয়ার বিপদে-আপদে নিজের জন্যও কোন প্রকার শোক-চিন্তা হওয়া উচিত ছিল না, নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্যও না। কেননা, বাসস্থান তো আমাদের আখেরাতে, দুনিয়ার আপদ-বিপদে বিচলিত কেন হইব? কিন্তু আমরা তো আখেরাতকে বাসস্থান মনে করি না। ইহার লক্ষণ এই যে, আমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু আসিলে মনে হয়, যেন আমাদিগকে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

কোন এক বৃদ্ধ একদিন হযরত হাজী ছাহেব রাহেমাহুল্লাহ্‌র নিকট আসিয়া বলিলঃ হুযূর! আমার স্ত্রী মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত। তিনি বলিলেনঃ ভাল হইয়াছে। কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে। আরও বলিলেনঃ চিন্তা কেন করিতেছ, অচিরেই তোমারও যাইতে হইবে। সে ব্যক্তি বলিলঃ আমার রুটি পাকাইবে কে? হুযূর বলিলেনঃ সে কি মাতৃগর্ভ হইতেই রুটি পাকাইতে পাকাইতে আসিয়াছে? মোটকথা, মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের গেঁহু-চিন্তার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা আখেরাতের কথা ভুলিয়াই গিয়াছি। নচেৎ এত অন্ন-চিন্তা হইত না। আখেরাতকে নিজের বাসস্থান মনে করার আর একটি লক্ষণ এই হওয়া উচিত যেন কাহারও সঙ্গে শত্রুতা ও মনোবাদ না হয়, যদিও কোন ব্যাপারে মামুলি ধরনের ঝগড়া-বিবাদের উৎপত্তি হইয়া যায়। রেলগাড়ীতে যাত্রীদের মধ্যে পরস্পর সাধারণ তর্ক-বিতর্ক অবশ্য হয়, কিন্তু এমন কখনও হয় না যে, নিজের তল্পিতল্পা ছাড়িয়া কাহারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। কেননা, প্রত্যেকেই বুঝে যে, ইহাতে সফরে বৃথা বিলম্ব হইবে ও অযথা সময় নষ্ট হইবে। ভাবিয়া দেখুন, এইরূপে দুনিয়ার বৃথা ঝামেলা

www.BANGLAKITAB.com

সম্বন্ধে কেহ কোনদিন চিন্তা করিয়াছেন যে, ইহাতে লিপ্ত বা জড়িত হইলে অনর্থক আখেরাতের সফরে ব্যাঘাত হইবে। বৃথা সময় নষ্ট হইয়া আখেরাতের কাজের ক্ষতি হইবে। কিন্তু মানুষ যখন বৃথা দুনিয়ার ঝগড়া-বিবাদে জড়িত হইতেছে, তখন মনে হইতেছে আখেরাতকে তাহারা নিজের বাড়ী বলিয়া মনে করে না। এতদ্ভিন্ন আখেরাতকে নিজের প্রকৃত ঘর-বাড়ী মনে করিলে দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাব-উপকরণ লইয়া এমন গর্ববোধ করিত না। যেমন, সফরকালে হোটেল বা মুসাফিরখানায় যদি কেহ শয়ন করিবার জন্য জাজিমযুক্ত পালং পায়, তজ্জন্য সে কখনও গর্বিত হয় না। কেননা, সে ভাল করিয়াই জানে যে, ইহা তো চাহিয়া লওয়া হইয়াছে, ইহা ক্ষণ-স্থায়ী। কাজেই ইহাতে গর্বিত হওয়ার কিছুই নাই। অথচ আমাদের অবস্থা এই যে, চারিটি পয়সার মালিক হইলেই তাহা লইয়া গর্ববোধ করি। ইহাতে প্রমাণ হয়, আমরা দুনিয়াকেই নিজের ঘর-বাড়ী মনে করিতেছি। আমাদের আরও অনেক কাজের দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, আমরা দুনিয়াকেই নিজেদের স্থায়ী বসতবাটি মনে করিয়া থাকি। ইহাই আমাদের মধ্যে প্রধান দোষ। ইহার কারণেই আমাদের আখেরাতের কাজে অলসতা এবং গাফলতি পরিলক্ষিত হইতেছে। এই তো হইল আমাদের অবস্থা, যাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা আখেরাতকে নিজের স্থায়ী বসতি মনে করি না। ছাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) প্রতি লক্ষ্য করুন, তাঁহারা কেমন কষ্ট সহ্য করিয়াছেন! কিন্তু কোন সময় তাঁহারা ঘাবড়াইয়া পড়েন নাই। পার্থিব এ সমস্ত খুঁটিনাটি বিপদ-আপদ তাঁহাদের কি বিচলিত করিবে? সকলের সেরা বিপদ মৃত্যুর প্রতিই তাঁহারা আগ্রহান্বিত থাকিতেন। কখন তাঁহারা এই দুনিয়ার কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিবেন সেই প্রতীক্ষায় থাকিতেন। একান্ত বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করার মত নিতান্ত নিরুপায়ের অবস্থাতেই তাঁহারা দুনিয়ার উপার্জনও করিতেন। অতএব, বুঝা যায়, তাঁহারা আখেরাতকেই নিজেদের প্রকৃত বাসস্থান বলিয়া মনে করিতেন। ইহাই ছিল উহার লক্ষণ।

দুনিয়ার সহিত কি পরিমাণ সম্পর্ক রাখা উচিত ঃ আমি যে বলি, দুনিয়াকে নিজের বাসগৃহ মনে করিও না। ইহার অর্থ এই নহে যে, দুনিয়া মোটেই উপার্জন করিও না। দুনিয়া উপার্জনে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু এমন যেন না হয় যে, উহাতে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইয়া যাও। যেমন, আমাদের অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। দোকানে কাপড় পছন্দ করিতে গেলে মনে হয় যেন ইহাই আমাদের দ্বীন, ইহাই আমাদের ঈমান অর্থাৎ, যথাসর্বস্ব। অলঙ্কারের পাছে পড়িলে তো উহার কল্পনাই সর্বক্ষণ মন জুড়িয়া থাকিবে। আমি আবার বলি, দুনিয়ার কাজ-কর্ম করিতে আমি নিষেধ করিতেছি না। শুধু এতটুকু বলি যে, ইহাতে আকৃষ্ট হইবে না। সমস্ত কাজই কর, কিন্তু উহা হইতে নিঃসম্পর্ক থাক। মনকে দুনিয়ার কাজে মত্ত করিয়া দেওয়াই বিষতুল্য। ইহা এমন একটি "বালা", মৃত্যুকালে ইহাই তোমার হৃদয়ে প্রবল হইয়া তোমাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের নাম হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন করিয়া দেওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং যথাসাধ্য চেষ্টা কর যেন দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট না হও। অন্তরকে আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট রাখ এবং হাতে সর্বপ্রকারের কাজ করিতে থাক, কোনই ক্ষতি নাই।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ স্বয়ং হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম নিজের হাতে করিতেন। কিন্তু মসজিদে আযান হওয়ামাত্র তাঁহার অবস্থা এরূপ হইত যে, قَامَ كَأَنَّهُ لَايَعْرِفُنَا "উঠিয়া দাঁড়াইতেন, যেন তিনি আমাদিগকে চিনেনই না।" অথচ

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের অবস্থা এইরূপ—বিশেষত মেয়েদের অবস্থা; সেলাইর কাজে লিপ্ত হইলে নামাযের চিন্তাও থাকে না। এইরূপে দুনিয়ার যাবতীয় কাজে মগ্ন হইলে বুঝা যায় যে, তাহারা ধর্ম-কর্মের কোন খবরই রাখে না এবং ধর্ম-কর্মের প্রতি তাহারা কোনই গুরুত্ব প্রদান করে না। আফসোস, ধর্ম কি এতই অবহেলার বস্তু? এরূপ আচরণ দুনিয়ার কাজে করিলেই সঙ্গত হইত। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

غم دین خور غم غم دین ست ـ همـه غمهـا فروتـراز ایں ست
غم دنیا مخور که بیهوده است ـ هیـچ کس در جهاں نیاسوده ست

"ধর্মের চিন্তা কর, ইহাই প্রকৃত চিন্তা, ইহার সম্মুখে অন্যান্য চিন্তা কিছুই নহে। দুনিয়ার চিন্তা করিও না, ইহা নিষ্ফল, দুনিয়াতে কেহই কোনদিন তৃপ্ত হইতে পারে নাই।" বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়ার চিন্তার অবস্থা যেন স্বপ্নের চিন্তা। স্বপ্নে যদি কাহাকেও সাপে দংশন করে, তৎক্ষণাৎ ভীত-চকিত হইয়া তাহার নিদ্রা ছুটিয়া যায় এবং দেখিতে পায়, কোমল 'জাজীম'যুক্ত পালঙ্কের উপর শায়িত রহিয়াছে, বিরাট অট্টালিকা, চতুর্দিকে লোকজন মস্তক অবনত করিয়া তাহাকে নমস্কার করিতেছে। এমতাবস্থায় তাহার হৃদয়ে স্বপ্নযোগে সর্প দংশনের চিন্তা থাকিবে কি? কখনই থাকিবে না।

অনুরূপভাবে ইহজগতের আনন্দও স্বপ্নের আনন্দেরই সমতুল্য। মনে করুন, কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল সে রাজসিংহাসনে সমাসীন, একটু পরেই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিতে পাইল তাহার চতুর্দিকে হাতকড়া হস্তে পুলিসের সারি দণ্ডায়মান, তাহাকে বন্দী করিয়া জেলখানাভিমুখে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় স্বপ্নে দৃষ্ট রাজত্বে সে আনন্দিত হইতে পারিবে কি? কখনই নহে।

দুনিয়ার চিন্তা এবং আনন্দের অবস্থাও ঠিক এইরূপই মনে করিবেন। খোদার দরবারে যদি আনন্দের সহিত গমন করিতে পারিল, তবে ইহজগতের সারাজীবনের চিন্তা বা দুঃখ-কষ্ট কিছুই নহে। পক্ষান্তরে যদি বিষণ্ণ এবং চিন্তিত অবস্থায় আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইল, তবে ইহ-জগতের সারা জীবনের আনন্দ এবং আহ্লাদ সবই মাটি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আপনারা এই স্বপ্নবৎ দুঃখ-কষ্ট এবং আনন্দকে সত্যিকারের দুঃখ-কষ্ট ও আনন্দ মনে করিতেছেন। ইহার কারণ তাহাই, যাহা অদ্যকার সভায় আমার আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ, আপনারা দুনিয়াকে নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান মনে করিয়া রাখিয়াছেন। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কখনও তাহা মনে করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে অহংকার ছিল না, আস্ফালন ছিল না এবং তাঁহারা কোন মানুষকে ভয়ও করিতেন না। কেননা, তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আসক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন, সদাসর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষমাণ থাকিতেন। ছাহাবায়ে কেরাম তো অনেক উচ্চ স্তরের লোক, ওলীআল্লাহ্‌গণের অবস্থাও তদ্রূপই হইয়া থাকে।

হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গোহী (কুদ্দেসা সিররুহু) যখন রিক্তহস্ত এবং ক্ষুধাপীড়িত হইতেন এবং তাঁহার স্ত্রী কয়েক বেলা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করার পর যখন অস্থির হইয়া ক্ষুধার অভিযোগ করিতেন, তখন তিনি বলিতেন ঃ "অদূর ভবিষ্যতে আমরা বেহেশ্‌তে যাইতেছি। তথায় আমাদের জন্য বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে।" ধর্মপ্রাণ স্বামীর স্ত্রীও ধর্মপ্রাণই ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি মানিয়া যাইতেন আর 'উঁ'শব্দটি করিতেন না। তিনি আজকাল-কার স্ত্রীদের ন্যায় ছিলেন না। আজকালের স্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপও আছে, তাহাদের পক্ষে